Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাইয়্যেবা তানজিন

রোলঃ 227021036

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাইয়্যেবা তানজিন

রোলঃ 227021036

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাইয়্যেবা তানজিন, আইডিঃ 227021036 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তাইয়্যেবা তানজিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তাইয়্যেবা তানজিন

আইডিঃ 227021036

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

দ্বীনী ইলম ছাড়া জাতিকে পথ প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। যখন কোন জাতি অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, তখনই আল্লাহ ঐ জাতির নিকট একজন নবীকে অহি-র জ্ঞানসহ পাঠিয়েছেন। জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা লুটতরাজ, রাহাজানি, গোত্রকলহ, যেনা-ব্যভিচার সহ যাবতীয় অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীতে পর্যায়ক্রমে অহি-র জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষদেরকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলেন। বর্তমান বিশ্বে সূদ, ঘুষ, খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি, যেনা-ব্যভিচার, হরতাল-অবরোধ, গুম ইত্যাদির জয়জয়কার চলছে। তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে মানুষ আজ বিভীষিকার মধ্যে নিমজ্জিত। এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হল প্রকৃত শিক্ষা।

ইলমের সংজ্ঞা

আরবী ভাষায় (আরবি: علم, **"ইলম"**) শব্দটি দ্বারা **জ্ঞান, অনুধাবন** ও **উপলব্ধি করা** কে বোঝানো হয়।বাংলা ভাষায় কখনো কখনো **এলেম** শব্দটি দ্বারাও একে বোঝানো হয়, যার অর্থ হল; জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা বা বিদ্যা তবে ইসলামী পরিভাষায় শব্দটি দ্বারা প্রায়শই শুধুমাত্র 'ইসলামি জ্ঞান' কে বোঝানো হয়ে থাকে।

আরবি বহুবচন এবং উসমানীয় তুর্কিতে এটি *উলুম* নামে পরিচিত।

এলেম এটি একটি আরবি শব্দ।আইন লাম মিম এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়ে এলেম শব্দটি গঠিত। উলামায়ে কেরামের পরিভাষায় শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কেউ কেউ বলেন এলেমের অর্থ সত্যায়ন করা। চাই তা ইয়াকিনী হোক বা অন্য কিছু। আর অভিধান অনুযায়ী এলেম অর্থ ইয়াকিন বা বিশ্বাস। এর আরেক অর্থ হচ্ছে আকলের সাহায্যে অনুধাবন করা।আর এই অর্থের ভিত্তিতেই এলেম শব্দটি কল্পনা ধারণা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বস্তুত: এলেম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সিফাত বা অন্যান্য গুণাবলীসমূহের একটি যা এলেমের মর্যাদা কে সমুন্নত করেছে।করেছে তাকে চিরন্তন।

এলেমের আরেকটি অর্থ হচ্ছে

اداك المساءل عن دليل

তথা দলিলের ভিত্তিতে মাসালা আয়ত্ত করা।

এলেমের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্বসূধীগণ এর অন্তর্নিহিত একটি সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। যে সংজ্ঞাই এলেমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত ইলেমের আলামত ফুটে ওঠে।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন,
ليس العلم بكثرة الرواية،انما العلم خشية الله
বেশি বর্ণনা করা ও অধিক পরিমাণ আক্ষরিক জ্ঞান হাসিল করার নাম ইলেম নয় বরং এলেম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ভয়ের নাম।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেতেন
الحكمة والعمل نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المساءل،ولكن عليه علامة ظاهرة وهو التجافي عن دار الغرور والانابة الي دار الخلود.

হেকমত ও আমল হচ্ছে একটি নূর। যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে পথ দেখান। আর বেশি বেশি মাসয়ালা জানার নাম এলেম নয়। এর একটি আলামত আছে তা হচ্ছে, ইলমের বদৌলতে ধোঁকার এই জগত থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং চিরস্থায়ী জগতের দিকে মনোযোগী হওয়া।

ইমাম শাফি (রহ.) বলতেন وما العلم الا الامل به والعمل به ترك العاجل للاجل

এলেম হচ্ছে আমলের নাম। আর আমল হচ্ছে স্থায়ী জগতের স্বার্থে ক্ষণস্থায়ী জগৎ পরিহার করা।

ইলমের হাকিকত?

ইলমের হাকিকত কী?বা প্রকৃত এলেম কাকে বলে?
এলেম হল ওহীর জ্ঞান তথা কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানকেই কেবলমাত্র ইলিম বলা হয়।অন্য কোন বিদ্যা জ্ঞান কে এলেম বলা হয় না।
বর্তমান পৃথিবীতে অনেক রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যা রয়েছে। কিন্তু এগুলোকে এলেম বলা যাবে না। ইলেম হিসেবে শরীয়ত এগুলো স্বীকৃতি ও দেয় না। বেশি থেকে বেশি এগুলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ পাক নবীর দায়িত্ব ও কাজ দিয়ে, দ্বীন ইসলাম নামক মনোনীত ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেন এবং একান্ত সুষ্ঠুভাবে এ কাজ পরিচালনার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান দান করেন। কোরআন সুন্নাহর এই জ্ঞানী হলো দীনি ইলম বা এলমে দ্বীন।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং আহমাদ (রহ.) বলতেন,

تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها

'রাতের কিছু অংশে ইলমের আলোচনা করা আমার কাছে সারারাত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার চেয়েও প্রিয়।'

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

يا أيها الناس عليكم بالعلم فإن لله سبحانه رداء يحبه فمن طلب بابا من العلم رداه الله عز وجل بردائه فإن أذنب ذنبا استعتبه ثلاث مرات لئلا يسلبه رداءه ذلك وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت

'হে লোক সকল! তোমরা ইলম গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তা'আলার একটি চাদর আছে, যা তিনি পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি ইলমের কোনো দরজা অন্বেষণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজ চাদরে আশ্রয় দেন। যদি সে কোনো গুনাহ করে, তাকে তিনবার এর শাস্তি থেকে সতর্ক করে যেন তার থেকে নিজ চাদর ছিনিয়ে নেওয়া না হয়। যদিও এ গুনাহ আমৃত্যু দীর্ঘায়িত হয়।'

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলতেন,

ذللت طالبا فعززت مطلوبا

'ইলম অন্বেষণের সময় তুচ্ছ থেকেছি ফলে উস্তাদ হয়ে সম্মানিত হয়েছি।'

আবূদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة

'একটি মাসআলা শিক্ষা করা আমার দৃষ্টিতে ইবাদতের জন্য সারারাত জাগ্রত থাকার চেয়ে শ্রেয়।'

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه

'রাত্রি জাগরণকারী এবং সাওম পালনকারী এক হাজার আবেদের মৃত্যুর চেয়ে আল্লাহ তা'আলার হালাল-হারামের জ্ঞান রাখা একজন আলেমের মৃত্যু অনেক বেশি ভারি।'

আবূদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আরো বলতেন,

من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله

'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হওয়াকে জিহাদ বলে মনে করে না তার চিন্তা ও বিবেকের ঘাটতি আছে।'

ইলমের প্রচারকের ফযীলত বর্ণনা করে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

من حدث حديثا فعمل به فله مثل أجر من عمل ذلك العمل

'যে ব্যক্তি অন্যের কাছে একটি হাদীছ বর্ণনা করল আর সে ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করল তবে বর্ণনাকারীও সমপরিমাণ ছাওয়াব লাভ করবে।'

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলতেন,

عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه موت رواته

'ইলম উঠে যাওয়ার আগেই তা শিক্ষা কর। আর এর উঠে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাকারীর মৃত্যু ঘটা।'

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কুমাইলকে লক্ষ্য করে বলতেন,

،يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق

'হে কুমাইল! ইলম সম্পদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইলম তোমাকে পাহারা দেয় আর সম্পদকে তোমার পাহারা দিতে হয়। ইলম শাসক, পক্ষান্তরে সম্পদ প্রজা। সম্পদ খরচ করলে কমে যায় কিন্তু ইলম খরচ করলে তা বৃদ্ধি পায়।'

এলমে দিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এলমে দিনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন যাপন করা। বান্দা তার ইহ ও পরকালের সফলতা অর্জন করে সুখের ঠিকানা জান্নাতের অধিবাসী হতে পারা।

এই ইলেম কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয় যে যার ইচ্ছা হবে অর্জন করবে মন চাইলে বাদ দেবে। বরং বয়স প্রাপ্ত ও বুদ্ধি সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এই এলিম শিক্ষা করা ওয়াজিব।

ইলমের উদ্দেশ্য আল্লাহকে পাওয়া

একটা শের হযরত হাফেজ্জী হুযূর পড়তেন-

جز یاد دوست ہرچہ کنی عمر ضائع است + جز سر عشق ہرچہ بگوئی بطالت است

سعدیؔ بشولوح دِل از نقش غیر حق + علمے کہ راہ حق ننماید جہالت است

'আল্লাহর যিকির ছাড়া যত কিছুই তুমি কর, তোমার জীবন বৃথা/ আল্লাহর ইশক ছাড়া যত কিছুই তুমি অর্জন কর, সবই বেকার/ সা'দী! হৃদয় থেকে মুছে ফেল গায়রুল্লাহর নাম/ যে ইলম আল্লাহর পথ না দেখায়, সে ইলম জাহালত ছাড়া কিছুই না।

ইলমেদ্বীন শেখার উদ্দেশ্য সার্টিফিকেট হতে পারে না

নতুন এক 'মরয' (রোগ) দেখা দিয়েছে অনেক তালিবুল ইলমের মধ্যে, তারা আলিয়ায় পরীক্ষা দেয়। কেন ভাই! তুমি আলিয়ায় পরীক্ষা দিয়েছ কেন? বলে যে, সার্টিফিকেটের জন্য, চাকরির

জন্য। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তুমি কার চাকরি করবে? ইলম শিখে তুমি কার গোলামী করবে?

এটি একটি রোগ। এ রোগে যারা আক্রান্ত হয়ে গেছ, খেয়াল করে শুনে রাখ, এটি দুনিয়া। এটি খালেস নিয়ত না। ইলম তো এমন এক জিনিস, যা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই শিখতে হয়।

জুমার খুতবায় এ হাদীসটি পড়া হয়-

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَعْنِي رِيحَهَا.

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জনীয় ইলম শুধু এজন্য অর্জন করে যে, এর দ্বারা দুনিয়ার কিছু বিষয় অর্জন করবে, সে জান্নাতের খোশবুও পাবে না। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

সূত্র -মাসিক আল কাউসার

ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব

সম্পর্কে জেনে সে অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করলেই একজন খাঁটি মুসলমান হওয়া যাবে।যারা এ দ্বীন সম্পর্কে জানে না, কোন ধারণাও রাখে না এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না সে খাঁটি মুসলমান নয়। তাই ইসলামের প্রতিটি শাখায় অবাধ বিচরণ করা তার পক্ষে সম্ভবও নয়।এলমে দ্বীন অর্জন করা তথা প্রতিটি মুসলমানের জীবন তার দ্বীন মোতাবেক পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন এলেম অর্জন ফরয করে দেয়া হয়েছে।সুতরাং দ্বীনের জরুরী জ্ঞান অর্জন করা মুসলমান হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত।

এলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এলমে দ্বীন অর্জনের ব্যাপারে বহু তাকিদ এসেছে।ইলেম অর্জন ব্যতিরেকে শরীয়ত জানার কোন পন্থা নেই। সুতরাং এখানে আমরা আল্লাহ চাইলে এ বিষয়টি স্পষ্ট করব -এই এলেম কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয় যে, যার ইচ্ছা হবে অর্জন করবে, মন চাইলে বাদ দেবে। বরং বয়স প্রাপ্ত ও বুদ্ধি সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এই এলেম শিক্ষা করা ওয়াজিব। ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো আল্লাহর হুকুম না জেনে কোন কথা ও কাজে মশগুল হওয়া মুসলমানের জন্য হারাম।মুসলমান তার চাহিদা মাফিক কাজে অগ্রসর হবে বিচক্ষণতার সাথে, জ্ঞাতসারে।তাই যে কোন কথা ও কাজের পূর্বে তার এলেম অর্জন করা ওয়াজিব। একজন মুকাল্লাফ ব্যক্তির জন্য সর্বাগ্রে ঈমানে মুজমাল -এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব,আমল সহীহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যা পূর্ব শর্ত।ঈমানে মুজমাল শিখলে এলেম অর্জনের অপরিহার্যতার বিষয়টা সামনে আসে।কারণ যে মানুষটি মুসলিম হতে চায় প্রথমেই তার জন্য ওয়াজিব হয় ঈমানের মুজমাল তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি ঈমান আনা। বিশ্বাস স্থাপন করা। এই প্রকার

ঈমানকেই' ইকরার বিশ শাহাদাহ' নামে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে বান্দার উপর আবশ্যক হয় ঈমানের অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করা, যার উপর আমল করা ওয়াজিব।আর তা জানতে হয় ঈমানে মুফাসসাল এর মাধ্যমে।ফলে এলেম অর্জনের বিষয়টি যেন ঈমানের মুজিমাল ও ঈমানে মুফাসসিলের মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ দিচ্ছে। প্রসঙ্গত না জেনে কথা বলা না বুঝিয়ে কোন কাজে জড়ানো হারাম। কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন

قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ولم ينزل به سلطنا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون.

আপনি বলে দিন আমার পালনকর্তা অশ্লীল বিষয়ে হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। এবং হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায় অত্যাচার এবং আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, যার কোন সনদ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কোন কথা আরোপ করা যা তোমরা জানো না।

সূত্র-সূরা আরাফ, আয়াত ৩৩।

বাহ্যিক অর্থে আয়াটির মাধ্যমে কথা ও কাজের আগে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক সুস্পষ্টভাবে তা প্রতিমান হয়। যেমন শিক্ষাদান করার মামলা-মোকদ্দমার ফয়সালা করা এবং ফতোয়া দেওয়া।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন এই নিষেধাজ্ঞামূলক বিধান উপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হওয়া এটা শয়তানের প্রচারণার অংশ।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।অজ্ঞাতসারের বিতর্কে জড়ানো শয়তানি কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা এর পরিণাম মন্দ বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাব্বে করিম এরশাদ করেন

ولا تكف ما ليس لك به علمٌ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسولا

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কর্ণ,চক্ষু ও হৃদয় এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত তো হবে।সূরা বণী ইসরাইল আয়াত ৩৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম জোর নির্দেশ দিয়ে বলেন: ان اناس بن مالك قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :طلب العلم فريضه على كل مسلم

অর্থ- হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত -তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। ইবনে মাজাহ হাদিস নাম্বার ২২৪

অন্য হাদিসের ইরশাদ করেন -عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا واذا غضبت فاسكت واذا كتبت فاسكت

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন -রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন লোকদের দ্বীন শিক্ষা দাও, তাদের সাথে সহজ ব্যবহার কর এবং কঠিন ব্যবহার পরিহার কর। আর যখন তোমার রাগ আসে চুপ থাকো। আর যখন তোমার রাগ আছে চুপ থাকো। আর যখন রাগ আসে চুপ থাকো।মুসনাদে আহমাদ ২৫৬০

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل الذي ليس في خوفه ....

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন -রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন," যার পেটে কুরআনের কোনো অংশ নেই সে বিরান ঘর পরিত্যক্ত বাড়ির সমতুল্য।অর্থাৎ ঘরের সৌন্দর্য আবাদি যেমন বসবাসকারী দ্বারা হয়ে থাকে ঠিক তেমনি মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য ও আবাদী কোরআন দ্বারা হয়ে থাকে।তিরমিজি শরিফ দ্বিতীয় খন্ড 119 পৃষ্ঠা

উল্লেখিত হাদিস সমূহে ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই নিজের জীবন দ্বীন মোতাবেক পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আমাদের অর্জন করতে হবে,অবশ্যই অর্জন করতে হবে।এলমে দিন অর্জন করা প্রতিটি মুসলমান নর নারীর উপর ফরজ। সে ধনী হোক বা গরীব হোক, যুবক হোক বা বৃদ্ধ হোক, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক, পুরুষ হোক বা নারী হোক, ছোট হোক বা বড় হোক প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ যে তার দ্বীন মোতাবেক তার জীবনের প্রতিটি কাজ পরিচালনা করার মত এলেম অর্জন করবে। এটা তার উপর ফরজ দায়িত্ব।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَأْ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

কুরআন-সুন্নাহ্য় ইলম হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَكِّیْهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। -সূরা জুমুআহ (৬২) : ২

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী আমাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন-

یٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا.

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৩০

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন-

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে। -সূরা কাহাফ (১৮) : ৬৬

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন-

رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১১৪

আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে

নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِی الدِّیْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। -সূরা তাওবা (৯) : ১২২

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না। -তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন-

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ .

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

ইলমে শরয়ির ফরজে আইন পরিচিতি

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। -শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعملِ.

(সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)

এই কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ. বলেছেন, যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরয তার ইলম অর্জনও ফরয। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার ইলম অর্জনও সুন্নত। তদ্রূপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরয। যা মাকরূহে তাহরীমী তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়।

সূত্র -আল কাউসার

কোন ইলম শিক্ষা করা ফরয?

আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের ওপর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। হাদিসে এসেছে, ‘প্রতিটি মুসলমানের ওপর ইলম শিক্ষা করা ফরজ।’ (ইবনে মাজা : ২২৪)। প্রতিটি নর-নারীর ওপর জরুরি দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ফরজ। এর মধ্যে রয়েছে অজু, গোসল, নামাজ-রোজার ইলম। যার নেসাব পরিমাণ মাল আছে, তার জন্য জাকাতের ইলম শিক্ষা করাও ফরজ। যার ওপর হজ ফরজ তার হজের বিধানাবলি জানা ফরজ।

ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। যেন লেনদেনে নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এমনিভাবে প্রতিটি পেশাজীবীর জন্য তার পেশা সংক্রান্ত শরয়ি ইলম শিক্ষা করা ফরজ।

ইসলামের মৌলিক ৫ স্তম্ভের ইলম অর্জন করা, ইখলাস সংক্রান্ত ইলম অর্জন করাও ফরজ। কারণ ইখলাসের ওপর আমল কবুল হওয়া নির্ভরশীল। হালাল ও হারাম সংক্রান্ত ইলম, লৌকিকতা তথা রিয়া সম্পর্কে জানাও জরুরি। কারণ রিয়ার কারণে মানুষ আমলের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। হিংসা ও অহঙ্কার সংক্রান্ত বিধিবিধান জানাও আবশ্যক। কারণ এ দুটি আমলকে ধ্বংস করে দেয়, যেমন আগুন কাষ্ঠখণ্ড পুড়িয়ে দেয়। যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় বা বিবাহ-শাদি করতে চায়, তার জন্য ক্রয়-বিক্রয় ও বিবাহ সংক্রান্ত হুকুম জানাও ফরজ।

হারাম ও কুফরি বাক্যাবলি সম্পর্কিত ইলম থাকাও ফরজ। ইমাম ইবনে আবেদিন শামি (রহ.) বলেন, আমার জীবনের কসম! হারাম ও কুফরি বাক্য সম্পর্কিত ইলম বর্তমান সময়ের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি। কারণ অনেক মানুষ কুফরি কথা বলে তাদের অজ্ঞাতেই। এ কারণেই

জাহেল লোকদের জন্য প্রতিদিন তার ঈমানকে নবায়ন করা উচিত। আর দুজন সাক্ষীর সামনে প্রতি এক-দুই মাস অন্তর বিয়ে দোহরিয়ে নেওয়া উচিত। এমন কুফরি বক্তব্য পুরুষদের থেকে কম হলেও নারীদের থেকে অনেক হয়ে থাকে। (ফাতাওয়া শামি : ১/১২৬)

ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন, তিন প্রকার ইলম শিক্ষা করা ফরজ- ১. ইলমুত তাওহিদ, ২. ইলমুসি সির এবং ৩. ইলমুশ শরিয়াহ। অর্থাৎ এতটুকু জ্ঞান রাখা তওহিদ সম্পর্কে, যা দ্বীনের মূলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এ জ্ঞান রাখা যে, তিনি জীবিত, সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশালী, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী, তাঁর কোনো শরিক নেই, সব গুণে গুণান্বিত, মাখলুকের সিফাত থেকে পবিত্র। হযরত মোহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

দ্বিতীয় বিষয়, ইলমুস সির দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- অন্তরকে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে পবিত্র করা এবং কাম্য বস্তু দিয়ে ভরপুর করা। ইখলাস, নিয়ত, আমলের হিফাজত ইত্যাদি। আর ইলমুশ শরিয়ত বলতে উদ্দেশ্য হলো- ব্যক্তির জন্য যা কিছু আদায় করা ফরজ সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও ফরজ। (মিনহাজুল আবেদিন ইলা জান্নাতি রাব্বিল আলামিন, ইমাম গাযালি : ৪৮-৪৯)
অতএব আমাদের পার্থিব জীবনকে সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও শরিয়তসম্মতভাবে পরিচালনার ফরজ পরিমাণ জ্ঞানার্জন করতে হবে ও শিখতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে ফরজ পরিমাণ জ্ঞানার্জন করে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

এলেম ফরজ হওয়ার দলিল

ফরজে আইন পরিমাণ তলব করা ওয়াজিব হওয়ার অনেক দলিল কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা-য় বিদ্যমান আছে।আল্লাহ তাআলা বলেন

فسلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

তোমরা জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও যদি তোমরা না জেনে থাকো।(সূরা নাহল আয়াত ৪৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিক ইবনে হুয়াইরিসকে বলেন -

ارجعوا الى أهليكم فعلموهم

তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের এলেম শিক্ষা দাও।

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ কিতাবের এলেম অধ্যায়ে মালিক ইবনে হুয়াইরিস থেকে মুয়াল্লাক সূত্রে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তবে আজান, জিহাদ, আদাব ও আখবারুল আহাদ অধ্যায়ের একাধিক স্থানে হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমন আজান অধ্যায় ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটি মালিক ইবনে হুয়াইরিস থেকে নকল করেন ;মালেক বলেন - আমরা নবীজির কাছে এলাম। আমরা সবাই ছিলাম যুবক।প্রায় 20 রাত্রি তার নিকট অবস্থান করলাম। নবী আলাইহিস সালাম ছিলেন দয়ার আধার। তিনি আমাদের বললেন, যদি তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে যাও, তবে দেশবাসীকে এলেম শিক্ষা দিবে, তাদের সালাতের আদেশ করবে, সময় বলে দেবে যে এই সালাত এই সময় পড়বে।যখন সালাতের সময় হয়ে যাবে, তোমাদের একজন আজান দেবে। তোমাদের মধ্য থেকে যে সবচেয়ে বড় সে সালাতের ইমামতি করবে। (সহীহ বুখারি হাদিস নাম্বার ৬৮৫)

আরেক রেওয়ায়েতে আছে, নবী আলাইহিস সালাম বলেন- তোমরা স্বজনদের কাছে ফিরে যাও, তাদের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠা করো, ইলেম শিক্ষা দাও এবং শিখতে আদেশ করো। (সহি বুখারি হাদিস নাম্বার ৬৩১)

মুমিন হতে হলে এলেম জরুরী

অনেকের ধারণা ইলমের বিষয়টি কেবল ফজিলতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।অর্থাৎ ইলেম হাসিল করা ভালো এবং সওয়াবের কাজ আর না করা দোষণীয় নয় তবে সাওয়াব ও ফজিলত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর মাত্র।কিন্তু বিষয়টিকে আদৌ এমন? ফজিলতের মধ্যেই কি এলেম সীমাবদ্ধ? মোটেও তা নয়। বরং একজন মানুষের প্রকৃত মুমিন হওয়া নির্ভর করে এলেম হাসিলের ওপর। কারণ কোন ব্যক্তি এলেম হাসিল করা ছাড়া প্রকৃত মুমিনই হতে পারে না। কেননা মুমিন হওয়া নির্ভর করে দুইটি বস্তুর উপর। এক-সে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করবে না। দুই শরীয়ত নির্দেশিত পন্থা ছাড়া ইবাদত করবে না। আর এই দুইটি হচ্ছে তাওহীদের মর্ম বাণী। যথা اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ স. তাঁর বান্দা ও রাসূল।

সুতরাং তাওহীদের মর্মবাণীর মধ্যে এলেম অপরিহার্যভাবে জড়িত ও পরিব্যপ্ত। অতএব বোঝা গেল এলেম ছাড়া তাওহীদের মর্ম বাণী যথার্থভাবে উপলব্ধি হয়নি। একারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীতে ইলিমকে আমলের আগে প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন এবং একটা অধ্যায় কায়েম করেছেন নিম্নোক্ত শিরোনামে -باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى):فاعلم انه لا اله الا الله

এই অধ্যায় কথা ও কাজের আগে এলেন এ বিষয়ে

আল্লামা শেখ সা'দী রহ. এর কবিতা

*বনী আদম একমাত্র এলমে দ্বীন দ্বারা বুজুর্গী ও পরিপূর্ণতা লাভ করে, ইহকালের মর্যাদা, সম্মান,ধন, সম্পদ ও আসবাবপত্রের দ্বারা নয়।
*দ্বীনী ইলম এর জন্য মোমের মত গলে যেতে হয়, কেননা বে এলেম আল্লাহকে চিনতে পারেনা।
*বুদ্ধিমান ব্যক্তি এলমে দ্বীনের অন্বেষণকারী হয়, যেহেতু এলমে দ্বীনের বাজার সদা সর্বদা উজ্জ্বল থাকে।
*যে ব্যক্তি রোজ আযলে ভাগ্যবান ছিল সেই কেবল ইলমে দ্বীন অর্জন করার পথ গ্রহণ করেছে।
*এলমের দ্বীন অর্জ করা তোমার উপর ফরজ। আর এলমে দ্বীন অর্জনের জন্য বহুদূর ভ্রমণ করা আবশ্যক।
*যাও দ্বীনে এলেমকে আঁচলকে শক্তভাবে ধারণ করো, কেননা এলেম তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে।
*যদি তুমি বুদ্ধিমান হও এলেম ছাড়া অন্য কিছু শিক্ষা নিও না, বা শিক্ষা দিও না। কারণ, এলেম ছাড়া বেঁচে থাকা বড় ধ্বংসাত্মক কাজ।
*আখেরাত এবং দুনিয়ার মধ্যে তোমার জন্য ইলমে-ই যথেষ্ট, কেননা এলমে দ্বীনের দ্বারাই তোমার সমস্ত কাজ বিন্যস্ত ও শৃংখল লাভ করে।

আল্লামা শেখ সাদী রাহ. আমাদের খুব সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন যা আজীবন মনে রাখার মত। দুনিয়ার জাগতিক জ্ঞানের সাথে কুরআন সুন্নাহর এলেমের কোন তুলনা হতে পারেনা, তুলনা করা যাবেনা। জাগতিক জ্ঞান হলো তুচ্ছ আর ওহীর জ্ঞান হলে অনেক মূল্যবান সম্পদ, দামি নেয়ামত। তাই এ নিয়ামত অর্জনের জন্য প্রচুর পরিমাণে মেহনত করতে হবে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তাহলে সফলতা অর্জন সম্ভব, অন্যথায় ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই জুটবে না।

ইলমের সাথে ইলমের আদব শেখাও অপরিহার্য

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى،

ইলম শেখার আগেই মূলত ইলমের আদব শেখা উচিত। ইমাম ইবনে সিরীন রাহ. (১১০ হি.) বলেন-

كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم

'তারা যেমন ইলম শিক্ষা করতেন তেমনি আচার-আচরণও শিক্ষা করতেন। (আলজামি লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে, খতীব বাগদাদী ১/৭৯)

আমি একটু কম করেই বলেছি যে, ইলমের আগে না হলেও অন্তত ইলমের সাথে অবশ্যই ইসলামী আদব, বিশেষ করে ইলমের আদব শিখতে থাকা উচিত। কিন্তু এখন বাস্তবতা এই যে, প্রাতিষ্ঠানিক তলবে ইলমের যমানা শেষ হওয়ার পরও আমরা ইলমের গুরুত্বপূর্ণ আদব থেকেই উদাসীন থাকি। ইলম অর্জনের (?) পরও যেন আমরা আদব শেখার প্রতি আগ্রহী নই!

ফরয পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হল ইলম শেখার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে নবী-আদর্শের পরিপন্থী কোনো উদ্দেশ্য যেন কখনোই না হয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ প্রমাণিত-

لا تَتَعَلَّموا العلمَ لتُبَاهُوا به العلماء، ولا تُمَارُوا به السُّفَهَاء، ولا تَخَيَّروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار فالنار.

অর্থ : এজন্য ইলম অর্জন করো না যে, তা দ্বারা আলেমের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।-সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৭৭

আমরা লক্ষ্য করি না যে, অনেক সময় আমরা উস্তাযের সাথে যেভাবে ইশকাল ও ইতিরায শুরু করি তা কখনো কখনো মুবাহাত ও মুমারাতের পর্যায়ে চলে যায়। আমরা চিন্তা করি না যে, এটা আমাদের জন্য ধ্বংসের কারণ; দুনিয়াতেও, আখিরাতেও।

বর্তমানে অনেক সময় উস্তাযের নিকট ইশকাল পেশ করার বৈধতার অপব্যবহার করা হয়। ইশকালের পরিবর্তে সরাসরি ইতিরায করা হয়। ইশকাল তো হল লাযিম মাছদার। যেমন বলা হয়ে থাকে-أشكل عليَّ كذا অর্থাৎ আমার কাছে এটি জটিল মনে হচ্ছে। কারো কাছে কোনো কথা বা বিষয় জটিল মনে হলে, কোনো বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হলে কিংবা কিতাবের কোনো কথার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ হলে তার এই ইশকালটি যথাযথ আদব ও বিনয়ের সাথে উস্তাযের নিকট পেশ করতে পারে। কেননা এটি হল 'ইস্তিফহাম', যা ইলম শেখারই অংশ। তবে তা হতে হবে সংশ্লিষ্ট পূর্ণ আলোচনা শেষ হওয়ার পর। কারণ আলোচনার মাঝে থামিয়ে দেওয়াও আদব পরিপন্থী। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, আলোচনার শেষভাগে আপনার ইশকালের উত্তর পাওয়া যাবে। তখন তো আপনি নিজেই লজ্জা ও সংকোচ বোধ করবেন।

আরেকটি আদব হল ইশকাল পেশ করার আগে অনুমতি গ্রহণ করা এবং ইশকাল পেশ করার ক্ষেত্রে কখনো তর্কের ভাব প্রকাশ না পাওয়া। কেননা এটি মারাত্মক বেআদবী। আর তখন তা 'ইশকাল করা' থাকে না, 'ইতিরাযে' পরিণত হয়। ইশকাল পেশ করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু ইতিরায করা সম্পূর্ণ আদবপরিপন্থী। ইতিরায তো হল আপত্তি করা, উস্তায ও আলোচনার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যাওয়া। এটি কীভাবে জায়েয হতে পারে?

ইশকালের মর্ম বোঝার পর এ কথা বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, তালিবে ইলম উস্তাযের কাছে শুধু এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করবে, যে বিষয়ে বাস্তবেই তার কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যে বিষয়টি তার জানা আছে, অন্য কোনো উস্তায বা আলেমের কাছে শুনেছে, কোনো শরহ বা

হাশিয়ায় পেয়েছে কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনো কিতাব বা ইলমী সাময়িকীতে পড়েছে তা তো অজানা নয়। তবে কেন তা উস্তাযকে জিজ্ঞাসা করবে? তাও আবার দরসের মধ্যে?!

মুতালাআর প্রতি তাকিদ দেওয়ার একটি বড় হেকমত এটাও, যেন সব বিষয় উস্তাযের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তাই যে বিষয়টি জানা আছে, যে বিষয়ে কোনো ইশকাল বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি তা উস্তাযের নিকট জিজ্ঞাসা করার পিছনে কী রহস্য থাকতে পারে? সাথীদের অবগতি উদ্দেশ্য হলে তাকরারের সময় বলে দেওয়া যায়। তবে কি নিজের ইলম প্রকাশ করা উদ্দেশ্য? নাকি উস্তাযকে পরীক্ষা করা, উস্তাযকে পেরেশান করা উদ্দেশ্য? এগুলো কি ভালো কাজ? এগুলো ছাড়া আর কী হেকমত হতে পারে?

আমাদের তলবে ইলমের যামানা (আলহামদুলিল্লাহ, বান্দা এখনও তালিবে ইলম। যদিও তলবের হক ও আদবগুলোর পরিপালন যথাযথভাবে হয়ে উঠে না। আমি সকল সাথীর নিকট দুআর আবেদন করছি) এখনও নিকটঅতীত। আমি বা-আদব ও সমঝদার তালাবাকে দেখেছি, বিভিন্ন শরহ ও হাশিয়া থেকে যা তাদের বোঝা সম্ভব ছিল তা দরসে জিজ্ঞাসাই করতেন না। মুতালাআর আগেও করতেন না, পরেও না। মোটকথা, নিজের ইলম প্রকাশের জন্য বা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে পেরেশান করার জন্য কিংবা উদ্দেশ্যহীনভাবে দরসে অযথা কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা ইলম ও উস্তাযের আদবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর এমন আচরণ তালিবে ইলমের বরবাদির কারণও হয়ে যেতে পারে।

ইশকাল পেশ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব এই যে, নিজ প্রতিষ্ঠানের কোনো উস্তায বা নিজ উস্তাযের কোনো সমবয়সী আলেম কিংবা তাঁর কোনো উস্তাযের কোনো কথাকে দলিল বানিয়ে ইশকাল পেশ না করা। এটাও উস্তাযকে পেরেশান ও অপ্রস্তুত করার শামিল। তেমনিভাবে উস্তাযের চেয়ে পদ-স্তর বা বয়সে ছোট কোনো আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে অথবা যাদের সাথে তাঁর তবিয়তের অমিল আছে তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা-সব কিছুই পরিত্যাজ্য।

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী রাহ.-এর 'আপবীতী' কিতাবটি আমাদের মুতালাআ করা উচিত। এটি অনেক উপকারী একটি কিতাব। আকলে আম ও ফিকহুল হায়াত-এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমাদের হযরত খতীব ছাহেব (মাওলানা ওবায়দুল হক) রাহ. কিতাবটি মুতালাআর জন্য খুব তারগীব দিতেন।

এই কিতাবে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রাহ. একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন-

"একই সময়ের মুদাররিসগণের কোনো কথা বর্ণনা করতে চাইলে আগ্রহভরেই করা যায়, তবে মুদাররিসের নাম উল্লেখ না করে। এ বিষয়টির প্রতি আমি নিজেও অনেক গুরুত্ব দিতাম এবং তালিবে ইলমদেরকেও শুরু থেকেই এ ব্যাপারে তাম্বীহ করতাম। হযরত মাওলানা আবদুর রাহমান ছাহেব (কামিলপুরী) নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু-এর কাছে যেহেতু তিরমিযী শরীফের সবক ছিল আর এই অধমের কাছে সবসময় ছিল আবু দাউদ শরীফ। তখনকার তালিবে ইলম

কিছুটা সমঝদারও ছিল। আমার ও মাওলানা মারহুমের আলোচনায় কোনো অমিল পেলে তারা জোরালোভাবে আমার কাছে কিংবা মাওলানার কাছে ইতিরায করত। (ইশকাল পেশ করত।) আমার জানা ছিল যে, মাওলানা মারহুমও তাঁর সবকে বলতেন, তোমরা শায়খের নাম উল্লেখ করে আমাকে প্রভাবিত করতে চাও। কোনো ইতিরায করতে হলে শায়খের নাম উল্লেখ ছাড়াই করবে। আর আমিও একাধিকবার তলাবাদের বলেছি, তোমরা মাওলানার নাম উল্লেখ করে কখনো ইতিরায করবে না। কেননা তাঁর নাম শোনার পর তার কথা খন্ডন করা বে-আদবী। আর এক্ষেত্রে চুপ থাকা নিজের বিরুদ্ধমতকে গ্রহণ করার নামান্তর।''-আপবীতী, আদদ ৬, ২/৩৩, প্রথম পরিচ্ছেদ, আকাবির কা তরযে তালীম

মোটকথা, ইলমের জন্যও অনেক আকল-বুদ্ধির প্রয়োজন। সহনশীলতা ও আদব থাকা দরকার। কোন্ কথা উস্তাযকে কখনোই জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, কোন্ কথা নির্জনে বা খাস মজলিসে জিজ্ঞাসা করা উচিত আর কোন্ কথা দরস বা আম মজমায় জিজ্ঞাসা করা যায় আবার কোন্ কথা শুধু এমন উস্তাযকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত, যার সাথে দুই দিক থেকেই (অবশ্যই আদব ও ভাব-গাম্ভীর্যতা বজায় রেখে) বে-তাকাল্লুফির সম্পর্ক রয়েছে-এসব বিষয়ের বিবেচনা ও পার্থক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কিতাব ও ফনের সাধারণ জ্ঞান, পাঠ্যভুক্ত কিতাবের আলোচনার বাইরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অতিরিক্ত আলোচনা সবকিছু তালিবে ইলমের দায়িত্বে। তারা মুতালাআ করে এসব অর্জন করবে। এ বিভাগে হাওয়ালার প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর একাধিক কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয় এর বড় উদ্দেশ্য তো এটাই যে, তালিবুল ইলম তা নিজেই মুতালাআ করবে এবং এসব বিষয়ের জন্য আসাতিযায়ে কেরামকে তাকলিফ দিবে না। কোনো বিষয় না বুঝলে নির্জনে অনুমতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মাওয়াদ উস্তাযের সামনে পেশ করে ইশকাল হল করার চেষ্টা করবে। এর জন্য উস্তাযকে কষ্ট দেওয়া (যেমন, জবাব দেওয়ার কষ্ট বা খুঁজে বের করার কষ্ট ইত্যাদি) কখনো সমীচীন নয়। আলকাউসারের বিগত এক সংখ্যায় (মুহাররম ১৪৩৫ হি., নভেম্বর ২০১৩ ঈ.) শিক্ষার্থীদের পাতায়ও বান্দা এদিকে ইঙ্গিত করেছে।

দরস গ্রহণের এক গুরুত্বপূর্ণ আদব এটাও যে, কোনো মর্ম ও ব্যাখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে কিংবা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে উস্তাযের কোনো ভুল হয়ে গেলে (যা হওয়া খুবই সম্ভব) আর তালিবে ইলমের এ সম্পর্কে অবগতি থাকলে দরস বা আম মজমায় উস্তাযের নিকট তা পেশ করবে না; বরং নির্জনে গিয়ে পূর্ণ আদব বজায় রেখে উস্তাযের নিকট তা ব্যক্ত করবে। পরামর্শ প্রার্থনা বা মতামত প্রকাশের পদ্ধতিতে তাকে অবহিত করবে। আর সংশ্লিষ্ট মাওয়াদ বিদ্যমান থাকলে তা উস্তাযের সামনে পেশ করে দেওয়াই যথেষ্ট।

তালিবে ইলম, উস্তায ও মজলিসের অবস্থার বিবেচনায় কখনো মজলিসেও আদবের সাথে ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। সালাফের মাঝে এ ধরনের ঘটনাও রয়েছে। কিন্তু আমাদের মতো তালিবে ইলমদের জন্য ঐ পন্থাই সবচেয়ে নিরাপদ, যা দারাকুতনী রাহ. তাঁর উস্তাযের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছেন।

ইমাম আবু বকর ইবনুল আনবারী (মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, ২৭১-৩২৮ হি.), যিনি নাহু-লুগাতসহ কয়েকটি শাস্ত্রের ইমাম ও হাফেয ছিলেন প্রতি জুমাবারে তাঁর মজলিস হত। কোনো মজলিসে একটি হাদীস ইমলা করানোর সময় সনদের এক রাবীর নামে ভুল করে ফেলেন। ('হিববান'কে 'হাইয়ান' বলেছেন বা এ জাতীয় কোনো ভুল।) দারাকুতনী রাহ. (৩০৬-৩৮৫ হি.) সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি চিন্তা করলাম, তিনি এত বড় মানুষ, তাঁর সূত্রে লোকেরা এই ওহাম লিখে নিবে, এটা কেমন কথা? কিন্তু তাঁকে এই ভরা মজলিসে কী করে বলি? দারাকুতনী বলেন, মজলিস শেষ হলে আমি তাঁর মুসতামলীকে বললাম যে, অমুক নামের ব্যাপারে শায়খের ওহাম হয়ে গিয়েছে। সঠিক হল এই।

দারাকুতনী বলেন, পরবর্তী জুমায় আমি মজলিসে উপস্থিত হলে শুরুতেই ইবনুল আনবারী রাহ. মুসতামলীকে বললেন, লোকদেরকে বলে দাও যে, গত জুমায় অমুক হাদীস ইমলা করার সময় সনদের অমুক নাম উচ্চারণে আমি ভুল করে ফেলেছি। সঠিক নাম এই। আর এ কথাও বল যে, ওই নওজোয়ান (দারাকুতনীর দিকে ইঙ্গিত করে) আমাকে তা সংশোধন করে দিয়েছিল।

قال أبو الحسن (الدارقطني) : فأعظمتُ أن يُحْمَل عن مثله في فضله وجلالته وَهَم، وهِبْتهُ أن أُوقِفَه على ذلك، فلما انقضى الإملاء، تقدَّمتُ إلى المستملي، وذكرت له وَهَمه، وعَرَّفتُه صوابَ القول فيه.

ثم حضرتُ الجمعةَ الثانيةَ مجلسَه، فقال أبو بكر للمستملي : عَرِّف جماعةَ الحاضرين أنا صحَّفنا الاسمَ الفلاني، لما أملينا حديث كذا في الجمعة الماضية، ونَبَّهَنا ذلك الشابُّ على الصواب، وهو كذا، وعَرِّف ذلك الشابَّ أَنَّا رَجَعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال.

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ.-এর কিতাব 'সাফাহাত মিন ছাবরিল উলামা'য় (পৃষ্ঠা : ২৯৯) ঘটনাটির উল্লেখ আছে।

শায়খ রাহ. এতে তিনটি কিতাব থেকে সংক্ষেপ করে ইবনুল আনবারী রাহ.-এর জীবনী উল্লেখ করেছেন। কিতাব তিনটি হল : ১. তারীখে বাগদাদ, খতীবে বাগদাদী রাহ. (৩/১৮১-১৮৬) ২. ইনবাহুর রুয়াত আলা আনবাহিন নুহাত, জামালুদ্দীন কিফতী (৩/২০২-২০৭) ও ৩. ওফায়াতুল আইয়ান, ইবনে খাল্লিকান (১/৫০৩)।

আগের যমানায় প্রায় প্রত্যেক ইলম ও শাস্ত্রের ইমামগণের ইমলার মজলিস অনুষ্ঠিত হত, যেখানে তাঁরা সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের উলূম (জ্ঞান-বিদ্যা) নিজের স্মৃতি থেকে লেখাতেন। হুফফাযে হাদীসের ইমলার মজলিসগুলোর অনেক ঘটনা তারীখের কিতাবসমূহে সংরক্ষিত আছে। ইমলার মজলিসে এক বা একাধিক লোক থাকেন, যারা শায়খের নিকট ইমলার আবেদন করেন। মজলিসের আয়োজন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় থাকেন। মজমা বড় হলে শায়খের কথা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ উঁচু স্বরে পুনরাবৃত্তি করে দূর পর্যন্ত পৌঁছে দেন। যে ব্যক্তি এসব দায়িত্ব পালন করেন তাকে বলা হয় মুসতামলী।

হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী রাহ.-এর 'ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস' কিতাবেও ইমলার মজলিসগুলোর কয়েকটি মজার ঘটনা উল্লেখ আছে। আগ্রহী পাঠক মুতালাআ করে নিতে পারেন। ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আলমাবসূত'ও শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ.-এর ইমলাকৃত।

কথাগুলো প্রসঙ্গক্রমেই এসে গেছে। আমার মূল আলোচনা ছিল দরসে উস্তাযের ঘটনাক্রমে কোনো ভুল হয়ে গেলে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার আদব সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে দারাকুতনী রাহ.-এর ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

হযরত নানুতুবী রাহ. (১২৪৮-১২৯৭ হি.)-এর একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ। হযরত হাজী ছাহেব রাহ. (১২৩৩-১৩১৭ হি.) তাকে একটি খসড়া লেখা স্পষ্ট করে লিখে দেওয়ার জন্য দিলেন। ঘটনাক্রমে তাতে একটি শব্দ ভুল লেখা ছিল। তিনি ভাবলেন, নিজে থেকে সঠিক শব্দ লিখলে তা বে-আদবী হবে। আবার ভুলইবা কীভাবে লিখবেন? তাই সে জায়গা তিনি খালি রেখে দিলেন এবং হযরত হাজী ছাহেব রাহ.-এর নিকট আরয করলেন, হযরত! এই শব্দটি বুঝতে পারছি না। হযরত তা দেখে নিজেই শুধরিয়ে দিলেন।-কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠা : ১৬৪

আলোচনা যেন অসম্পূর্ণ না হয়ে যায় তাই এ কথাও উল্লেখ করছি যে, ফার্সী ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে-

طالب علمے کہ چوں چرا نکند ومریدے کہ چوں چرا کند ہر یکے را ببیابان فرستادن باید

অর্থাৎ যে তালিবে ইলম 'কেন-কীভাবে' প্রশ্ন করে না আর যে মুরীদ 'কেন-কীভাবে' প্রশ্ন করে উভয়কেই জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

এই উক্তির অর্থ এই নয় যে, অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হল বুঝেশুনে পড়া। আর তাহকীকের প্রয়োজনে যথাযথ আদব ও ভদ্রতার সাথে উস্তাযের কাছে নিজের ইশকাল ব্যক্ত করা এবং হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছতে চেষ্টা করা। অবশ্য তালিবে ইলমীর একটি স্তর ও মারহালা হল, কোনো ফনের বিশেষত্ব অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট ফনের তাফাক্কুহ অর্জিনকারী কোনো আহলে দিল ও আহলে যওক আলেমের সাহচর্য গ্রহণ করা। তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা। এক্ষেত্রে অবশ্য মামুন আববাসীর কথাই প্রযোজ্য হতে পারে। তিনি বলেছেন-

العلم على المناقشة أثبت منه على المتابعة.

-মিন আদাবিল ইসলাম, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ.

আর ইবনুল হুমাম রাহ.-এর উস্তায কারিউল হেদায়ার সাথে তাঁর আচরণ এরই অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে সাখাভী রাহ. الضوء اللامع কিতাবে ইবনুল হুমাম রাহ.-এর জীবনীতে লিখেছেন-

وأخذ الفقه عن السراج قاريء الهداية، قرأها بتمامها عليه في سنتي ثماني عشرة والتي تليها وبه انتفع وكان يحاققه ويضايقه بحيث كان يحرج منه مع وصف الكمال له بالتحقيق في كل فن.

আর ওলিউদ্দীন ইরাকী রাহ. ও ইবনুল হুমাম রাহ.-এর মাঝে যা হয়েছিল তা এরই অন্তর্ভুক্ত। ইমাম সাখাভী রাহ. বলেন-

وأخذ غالب "شرح ألفية العراقي" عن ولد مؤلفه الولي ورام أولا التدقيق في البحث بحيث يشكك في الاصطلاح فلم يوافقه الولي على الخصوص في ذلك.

এতে বোঝা গেল, বহস ও মুনাকাশা (যুক্তিতর্ক ও গবেষণা-অনুসন্ধান)-এর সাথে পড়তে চাইলে আগে থেকেই অনুমতি নেওয়া শর্ত। তবে এটা জরুরি নয় যে, উস্তাযের তবিয়ত সবসময় এর জন্য প্রস্তুত থাকবে। আর শাগরিদের মধ্যে এর যোগ্যতা ও রুচি থাকা তো সর্বাবস্থায় শর্ত। সালাফের যুগে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর সাথে তার বেশ কয়েকজন শাগরিদের আচরণ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ.-এর সাথে তার শাগরিদ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী রাহ.-এর আচরণ এ ধরনেরই ছিল।

ইবনে আবী হাতেম রাহ. হুমায়দী রাহ. (২১৯ হি.)-এর সূত্রে শাফেয়ী রাহ.-এরই যবানীতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের সোহবতের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তাতে এ কথাও আছে-

فلزمته وكتبت عنه، وعرفت أقاويلهم، وكان إذا قام ناظرت أصحابه، فقال لي : بلغني أنك تناظر أصحابي، فناظرني في الشاهد واليمين، فامتنعت فألح علي، فتكلمت معه، فرفع هو ذلك إلى الرشيد فأعجبه ووصلني.

-বুলুগুল আমানী, যাহেদ কাওছারী (১৩৭১ হি.), পৃষ্ঠা : ২২; তাওয়ালিত তাসীস, ইবনে হাজার আসকালানী, পৃষ্ঠা : ১২৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি আমার তালিবে ইলম ভাইদের খেদমতে আদবে ইলম সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করছিলাম। আমি আরয করেছি যে, আমরা বোঝার জন্য উস্তাযগণের কাছে অবশ্যই আদবের সাথে প্রশ্ন করব। হল না হলে নিজের ইশকাল পেশ করব। কিন্তু ইতিরায, বিরোধিতা ও বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। এমনকি নিজের ইস্তিফহাম (বোঝার জন্য কোনো প্রশ্ন করা) দ্বারা যেন বিরোধিতা ও বিতর্কের ভাবও প্রকাশ না পায়। অন্যথায় এটি আপনার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে যেতে পারে।

সালাফ ও আকাবিরের এই কথা সবসময় মনে রাখবেন-

ما وَصَل مَنْ وَصَل إلا بالحرمة، وما سَقَط من سَقَط إلا بترك الحرمة.

-তালীমুল মুতাআল্লিম, পৃষ্ঠা : ৪৬

এর ভাবার্থকে কোনো কোনো আকাবির এভাবে ব্যক্ত করেছেন-

ما فاز من فاز إلا بالأدب، وما سقط من سقط إلا بسوء الأدب.

-মাআলিমু ইরশাদিয়াহ লিছিনাআতি তালিবিল ইলম, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা, পৃষ্ঠা : ২৪৫-২৪৬

মাসিক আলকাউসারের শিক্ষার্থীদের পাতা মূলত তালিবে ইলম ভাইদের ইলমী সফরে সহযাত্রার বরকত ও সাআদত লাভের জন্যই প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই বিভাগের একটি

গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল, তালিবে ইলম ভাইদেরকে ইলমী বিষয়ে সালাফের আদর্শে আদর্শবান করে তোলা। তাদেরকে নিজ উস্তাযের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। নিজ প্রতিষ্ঠান ও উস্তাযের প্রতি সম্মানবোধ সৃষ্টি করা। তালীমী ও ইসলাহী মুরববীর প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁদের দেওয়া হেদায়াত, ইসলাহ ও তারবিয়তের গুরুত্ব অনুধাবন করানো।

তালিবে ইলমদের ইলমী ইশকালগুলোর সমাধান তুলে ধরা এ বিভাগের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্য। বারবার তাম্বীহ করা হয় যে, তালিবে ইলম যেন ইশকালগুলো নিজে নিজেই হল করার চেষ্টা করেন। ইলমের সাধারণ মালূমাত নিজেই খুঁজে বের করেন। আর তালীমী পরামর্শের বিষয়ে তো সব সময় নিজের তালীমী মুরববীর শরণাপন্ন হওয়ার জন্যই বলা হয়।

বান্দা তার তালিবে ইলম ভাইদের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সকাতর দরখাস্ত করছে, কোনো আল্লাহর বান্দা যেন কখনো বিভাগটিকে তার উদ্দেশ্যের খেলাফ ব্যবহার না করেন। যে হাদীস দ্বারা এই প্রবন্ধের সূচনা করা হয়েছে তা যেন মুখস্থ করে নেন, এর অর্থ ও মর্ম অন্তরে বদ্ধমূল করে নেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এর দাবি অনুযায়ী আমল করেন। আর আমাদের জন্য দুআ করেন যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন

এলমে দ্বীনের ফজিলত ও সম্মান

সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। -সূরা আলাক (৯৬) : ১-৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? -সূরা যুমার (৩৯) : ৯

কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। -সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

আরো ইরশাদ করেছেন-

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই. যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةِ.

যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। -আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল। -জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلّا لِخَيْرٍ يَتَعَلّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রতি আল্লাহর উৎসাহ প্রদান

মানুষ ইলম অর্জন করবে, সে অনুযায়ী আমল করবে এবং নিজেদের মাঝে ইলম প্রচার করবে এটাই আল্লাহর দাবী। আর এ জন্যই আল্লাহ জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

'সুতরাং এমন কেন হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল বের হবে, যাতে তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আর যাতে তারা নিজ কওমকে ভয় প্রদর্শন করতে পারে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা সতর্ক হয়' *(তওবা ৯/১২২)*। মানুষ অজ্ঞ-মূর্খ হয়ে পৃথিবীতে আসে। আল্লাহ বলেন, عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 'আমি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছি, যা সে জানত না' *('আলাক্ব ৯৬/৫)*। ইলম বা জ্ঞান দ্বারা ভাল-মন্দ নির্ণয় করা যায়। এর দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সুতরাং আল্লাহ যার মঙ্গল চান এবং যার দ্বারা হক্কের বাস্তবায়ন সম্ভব তাকেই মহামূল্যবান জ্ঞান দান করে থাকেন। যেহেতু জ্ঞানের মালিক আল্লাহ, তাই এই জ্ঞান আল্লাহ যাকে চান তাকে দান করেন। তিনি বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ 'তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় এবং কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে' *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন'।[3]

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল তাই এর আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সেগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে।

নিয়ত বিশুদ্ধ করা

সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে। আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّارَ.

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيَّتُه.

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে। -আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভ,ত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করব এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব।

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। এক. কারো লেখা পাঠ করা। দুই. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা। এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। প্রথম পদ্ধতির সবচে বড় উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে। -সহীহ বুখারী ১/২৪

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন-

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصَّحُفِ.

ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়। -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিক্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর 'আলমুআফাকাত' গ্রন্থে লিখেছেন-

قالوا إِنَّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ.

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে। -আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন-

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ। -সহীহ মুসলিম ১/১৪

ইলম :বান্দার প্রতি আল্লাহর প্রথম উপহার

আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করার পর তাদেরকে বিভিন্ন রকমের নিয়ামত দান করেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর করুণা ও দান এত বিস্তৃত সীমাহীন যে কারোর পক্ষে সেসব নেয়ামতের হিসাব করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন কোন নিয়ামত এত মূল্যবান যে হাজার নিয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও এসব নেয়ামতের কথা কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অমূল্য নেয়ামতরাজির অন্যতম হচ্ছে ইলেম।

এলেম শুধু মহা নেয়ামতই নয়; বরং বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার প্রথম উপহার, যা তিনি বান্দা তথা মানুষ সৃষ্টি করার পর তাকে দান করেছিলেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করার আগে

ফেরেশতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে তার নেতিবাচক পরামর্শ দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেন,

واذ قال ربك للملئكة اني جاعل في الارض قالوا اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ،قال اني اعلم ما لا تعلمون.

"আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমি জমিনে একজন খলিফা সৃষ্টি করছি, তারা বলল আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা জানো না। সূরা আল বাকারা আয়াত ৩০

এরপর তিনি আদম আলাই সাল্লাম কে সৃষ্টি করেন। তাকে সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম ইলেম শিক্ষা দেন এবং এলেমকেই ফেরেশতাদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে সাব্যস্ত করেন। যেমন পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন

وعلم ءادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملئكة فقال انبئوني هؤلاء ان كنتم صدقين -

"আর তিনি আদমকে সব নামসমূহ শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন । তারপর বললেন, তোমরা আমাকে এগুলো নাম জানাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও। সূরা আল বাকারা আয়াত ৩১

মোটকথা আল্লাহ তখন মানুষ সৃষ্টিতে দ্বিমতকারী ফেরেশতাদের সামনে কিছু বিষয়ে পেশ করেন যার জবাব দিতে তারা ব্যর্থ হন এবং তখন আদম আলাইহিস সাল্লামকে সেগুলোর জবাব দিতে বলেন।যেসব বিষয়ে ফেরেশতারা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করেন সেগুলো আদম আলাই সাল্লাম প্রকাশ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আল্লাহ তাআলা এভাবে ফেরেশতাদের সামনে ইলমের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন এবং এলেম গ্রহণকারী মানুষকে তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। সুতরাং বোঝা গেল নিষ্পাপ ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল এলেম। আল্লাহ তায়ালা যা মানুষকে প্রথম উপহার হিসেবে দান করেছেন।

এলেম অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে

মানুষের অন্তর ভালো-মন্দের পাত্র, কুফুরি ও ইমানের উৎস, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সর্দার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্দেশনার জন্য দায়ী এবং বিবেকের মূলযন্ত্র। অন্তর সুস্থ থাকলে দেহ-শরীর ঠিক থাকে, অন্তর নষ্ট হয়ে গেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। সাহাবি হজরত নুমান বিন বাশির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে

শুনেছি, ‘জেনে রেখো, দেহের মধ্যে একটি মাংসপি- আছে। যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহ সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন গোটা শরীর নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রেখো, তা হলো অন্তর।’ সহিহ্ বোখারি

অন্তর হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্পের অবস্থানস্থল। তা হুকুম-আহকাম আরোপ ও পরীক্ষার মুখোমুখী হওয়ার মূল কারণ। আমলের গ্রহণযোগ্যতা, হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব বৃদ্ধি ও শাস্তি অবধারিত হওয়া অন্তরের ওপর নির্ভর করে। হজরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘নিশ্চয় আমলের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করে।’ সহিহ্ বোখারি

হাদিসের ভাষ্যমতে, প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধির মূল মাধ্যম নিয়ত। মহান আল্লাহ ভালো কাজের নিয়তের জন্য প্রতিদান দেন, কিন্তু খারাপ কাজের নিয়তের জন্য পাকড়াও করেন না। আমল কবুল হওয়া এবং সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর এ বিষয়ে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো পাপ নেই, কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)। আর আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ সুরা আল আহজাব : ৫

অন্তর খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল। হজরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) বলতেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে এমন কিছু শুনেছি, যার পরে কোনো মানুষের শেষ অবস্থা না দেখে তাকে ভালো-মন্দ বলব না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কী শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, পাতিলের ভেতরে ফুটন্ত পানি অপেক্ষা বনি আদমের অন্তর অধিক পরিবর্তনশীল।’ মুসনাদে আহমদ

দুনিয়ায় নানা ধরনের ফেতনা, পরীক্ষা ও বিপদাপদের সময় আল্লাহ অন্তরকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে লোক গোপন নিয়ত যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অবহিত নয়, এর ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে সত্যবাদী হয়; আল্লাহ তাকে অটল রাখেন এবং ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্যবান করেন। অন্তর আল্লাহর আঙুলসমূহের দুই আঙুলের মধ্যে অবস্থান করে। তিনি যেভাবে চান সেভাবে পরিবর্তন করেন। শাহর বিন হাওশাব বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা.)-কে বললাম, ‘হে উম্মুল মুমিনীন! রাসুল (সা.) যখন আপনার কাছে অবস্থান করতেন তখন অধিকাংশ সময় তিনি কী দোয়া করতেন? তিনি বললেন, তার অধিকাংশ দোয়া ছিল ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বিত কালবি আলা দীনিক। অর্থাৎ হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তর তুমি তোমার দ্বীনের ওপর সুদৃঢ় রাখো। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি অধিকাংশ সময় এই দোয়া কেন করেন? তিনি বললেন, হে উম্মে সালামা! এমন কোনো মানুষ নেই যার অন্তর আল্লাহর আঙুলসমূহের দুই আঙুলের মধ্যে নেই। যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি দ্বীনের ওপর কায়েম রাখেন, আর যাকে ইচ্ছে বাঁকা করে দেন।’ সুনানে তিরমিজি

এ কারণে অন্তরের তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, পরিমার্জন ও পরিশুদ্ধকরণ প্রয়োজন। ইসলাম বলে, যে তার গোপন বিষয় সংশোধন করে, আল্লাহ তার প্রকাশ্য বিষয় সংশোধন করে দেবেন।

আর যে ব্যক্তি তার অভ্যন্তরীণ বিষয় সংশোধন করে, আল্লাহ তার বাহ্যিক বিষয় সংশোধন করে দেবেন। যেসব বিষয় ও কাজ অন্তরকে মেরে ফেলে, সব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখে এবং প্রত্যাশিত সব বস্তুকে বাঁধাগ্রস্ত করে, তা হলো অন্তরের কঠোরতা ও উদাসীনতা। এর ফলে অন্তরে মরিচা ধরে, অন্তরকে কল্যাণ ও ইমান থেকে বিরত রাখে। ফলে অন্তর পাপাচার ও অবাধ্যতার দিকে ধাবিত হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসুল রয়েছেন। তিনি যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিতেন, তাহলে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পতিত হতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ইমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন। আর তোমাদের কাছে কুফুরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তারাই তো সত্যপথ প্রাপ্ত।' সুরা আল হুজুরাত : ৭

পবিত্র কোরআন-হাদিসের অসংখ্যা জায়গায় বলা হয়েছে, মানুষের অন্তর রোগাক্রান্ত হয়, মারা যায়, কঠিন ও শক্ত হয়। ফলে তা পাথরের ন্যায় কিংবা তার চেয়েও অধিক শক্ত হয়ে যায়। মানুষের হৃদয় শুষ্ক ও কঠিন হয়ে গেলে তখন তাকে প্রভাবিত করা ও উপদেশ দেওয়ার সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। তাই তা চিকিৎসা গ্রহণ করে না, হেদায়েত কবুল করে না, উপদেশ মানে না, সত্যের কাছে নত হয় না। কোরআন মজিদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'তবে কি আপনি লক্ষ্য করেছেন তাকে, যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজ ইলাহ (উপাস্য) বানিয়ে নিয়েছে? আর তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তিনি তার কান ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তিনি তার চোখের ওপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পরে কে তাকে হেদায়েত দেবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

অতএব কথা ও কর্মের একে এলেম অর্জনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ এলেম ছাড়া কোন আমল কবুল হওয়া তো দূরের কথা তা শুদ্ধ ও যথাযথ পরিগ্রহ লাভ করেনা। সুতরাং আমাদের শিখতে হবে,শিখতে হবে প্রথমে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের এলেম। যাতে করে আল্লাহর পরিচয় লাভ হয়, আকিদা বা বিশ্বাস পরিশুদ্ধ হয়। নিজেকে চেনা যায় এবং কিভাবে নিজেকে বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করা যায় তাও জানা যায়।

ইলম দৃষ্টির আলো

এলেম হলো এমন আলোকবর্তিকা যার বিকিরণে সত্য উদ্ভাসিত হয় মিথ্যার বিলোপ ঘটে। এলেম হলো সেই দৃষ্টির আলো, যা দিয়ে মানুষ বস্তুর হাকিকত ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে।তবে এ কিন্তু চোখের দৃষ্টি নয় এ হল অন্তরের দৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা বলেন

افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের হতো এমন হৃদয় যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারত এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শুনতে পেত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়। সূরা হাজ্ব আয়াত ৪৬

উল্লেখিত আয়াতে জমিনে ভ্রমণ করার কথা বলে মূলত এলেম অর্জনের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এলমে পরশে একজন মাটির মানুষ এমন আলোকময় হয়ে উঠবে যে সত্য ও ন্যায়ের সকল পথ তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং নির্ভিগ্নে তাতে চলতে পারে।

এলেম মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে

কোন বস্তুর সঠিক উপলব্ধির পরেই কেবল তার মর্যাদা ও আজমত হৃদয় আসন গড়ে। আর এই উপলব্ধির ভিত্তি হল তার সম্পর্কে জানা। সুতরাং আলেম না যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অধিক জানেন সেহেতু তাদের অন্তরেই আল্লাহর মহব্বত অধিকতর গভীরভাবে প্রতিস্থাপিত হবে।যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন

انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور

বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। সূরা ফাতির আয়াত ২৮

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,
﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ مِن قَبۡلِهِۦٓ إِذَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ يَخِرُّونَۤ لِلۡأَذۡقَانِۤ سُجَّدٗاۤ ١٠٧ وَيَقُولُونَ سُبۡحَٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعۡدُ رَبِّنَا لَمَفۡعُولٗا ١٠٨ وَيَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعٗا۩ ١٠٩ ﴾ [الاسراء: ١٠٧، ١٠٩]

'নিশ্চয় এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, 'পবিত্র মহান আমাদের রব ! আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। {সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ১০৭-১০৯}

ইলেম অমূল্য সম্পদ

শায়খ বিন উসায়মীন রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

ইলম সম্পদ থেকেও অনেক অনেক দামী। যদিও কেউ মোটা অংকের সম্পদ দান করে, তথাপিও ইলমের প্রচার ও প্রসার অধিক উত্তম।

আসো, একটা উদাহরণ দেই।
আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে বেশ কয়েকজন খলীফা ও রাজা ছিল, যারা (অধিকাংশ) দুনিয়া রাজত্ব করেছেন।

আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহর যুগে এমন অনেক ধনী ছিল, যাদের সম্পদ ছিল অঢেল। সেখান থেকে তারা দান করেছে, বিভিন্ন খাতে ওয়াকফ করেছে।

তাদের পরে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ, ইবনুল কয়্যিম রহিমাহুমুল্লাহ-দের যুগেও অনেক ধনী ছিল, যারা দান করেছে, ওয়াকফ করেছে।

সেই সম্পদগুলো আজ কৈ?
ব্যয়িত মাল আছে কি?
ওয়াকফকৃত সম্পত্তি কোথায়?
সব হারিয়ে গেছে, কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।

কিন্তু আবূ হুরায়রা-র হাদীস দিন রাত সবসময় পঠিত হয়, আর তিনি প্রতিদান পান।

অনুরূপ, ইমামগণের যে ইলম ও ফিকহ উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে আছে, সেগুলোরও সওয়াব তারা পাচ্ছেন।

এরকমই শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ, ইবনুল কয়্যিম সহ অন্যান্য আলেমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা চলে গেছেন; কিন্তু তাদের স্মরণ আজ চির জাগরুক, সবাই জানে ও চেনে।

তারা সবাই কবরে গেছেন, কিন্তু সওয়াব পেতেই আছেন।

আর এটাই প্রমাণ করে, ইলম সম্পদের চেয়েও অনেক অনেক মূল্যবান এবং মানুষের অধিক উপকারী।

--[শরহু রিয়াযিস সলিহীন, ৫/৪৩৬]

ইলম অর্জনের মর্যাদা

ইলম অর্জনের মর্যাদা অত্যধিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*। ইলম অর্জনের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাছিল করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন।[5] অন্য হাদীছে এসেছে,
عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করা হল। যাদের একজন আলেম অপরজন আবেদ। তখন তিনি বলেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর। যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই তার প্রতি আল্লাহ রহমত করেন এবং তার ফেরেশতামন্ডলী, আসমান-যমীনের অধিবাসী, পিপিলিকা তার গর্তে থেকে এবং এমনকি মাছও কল্যাণের শিক্ষা দানকারীর জন্য দো'আ করেন।[6]
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অহি প্রেরণ করেছেন এই মর্মে, যে ব্যক্তি ইলম হাছিলের লক্ষ্যে কোন পথ গ্রহণ করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দেব এবং যার দু'চক্ষু আমি অন্ধ করেছি তার বদলে আমি জান্নাত দান করব। আর ইবাদত অধিক করার তুলনায় অধিক ইলম অর্জন করা উত্তম।[7] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ .

'যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা উহা দ্বারা তাকে জান্নাতের কোন একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকরীর উপর খুশি হয়ে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। এছাড়া আলেমদের জন্য আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসী আল্লাহর নিকট দো'আ ও প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যে বসবাসকারী মাছও (তাদের জন্য দো'আ করে)'।[8]

ইলম নিয়ে অহংকার করার পরিণাম

আল্লাহ তা'আল সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(লুকমান ৩১/২৭)*। আর তিনি মানুষকে অতি অল্পই জ্ঞান দান করেছেন। তিনি বলেন, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا 'তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৮৫)*। আল্লাহর জ্ঞান সর্ম্পকে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর জ্ঞানের পরিসীমা সম্পের্কে খিজির (আঃ) মূসা (আঃ)-কে বলেছিলেন, يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِى وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِى الْبَحْرِ 'হে মূসা! আমার ও তোমার জ্ঞানের স্বল্পতা আল্লাহর জ্ঞানের নিকট সমুদ্রের মধ্যে এই চড়ুইয়ের ঠোঁটের এক ফোটা পানির সমান।[16] মূসা (আঃ) একদা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি বললেন, আমি সবচেয়ে জ্ঞানী। মহান আল্লাহ তাকে সতর্ক করে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকটে অহী প্রেরণ করলেন। দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।[17] অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক আত্মঅহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِىُّ 'অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যাভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[18] সুতরাং ইলমের অহংকার না করে এর পরিসীমা আল্লাহর দিকে সোপর্দ করাই উত্তম।

আল্লাহর নিকট উপকারী ইলমের প্রার্থনা করা

আল্লাহর নিকট ইলমসহ যাবতীয় কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহর নিকট চাওয়ার মাধ্যমে ইলম অর্জিত হলে তা দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই অর্জন করা সম্ভব। আর যদি

না চাওয়াতেই ইলম আসে, তা দিয়ে দুনিয়া সম্ভব আখিরাত কখনই অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ‘অনেকে বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্য পরকালের কোন অংশ নেই’ *(বাক্বারাহ ২/২০০)*।

আর এজ্যই নবী রাসূলগণ একমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাইতেন। যেমন ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা করে বলেন, رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর’ *(শু‘আরা ২৬/৮৩)*। অনুরূপ মুসা (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي- وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي- يَفْقَهُوا قَوْلِي ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে’ *(ত্বহা ২০/২৫-২৮)*। আর এরই ধারাবাহিকতায় রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর নিকট উপকারী ইলমের প্রার্থনা করতেন। হাদীছের ভাষায় রাসূল (ছাঃ) প্রতি ফজর ছালাতের পর প্রার্থনা করতেন এ বলে যে , اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি’।[22] সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা।

ইলম অন্বষণে হিংসা

হিংসা করা মহাপাপ। হিংসা করার পরিণতি ভয়াবহ। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,
‘ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ
তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা মানুষের পূর্ণ আমলগুলো বিনষ্ট করে যেমন আগুন কাঠকে ভষ্মিভূত করে।[25] ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হিংসা করা জায়েয। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهْوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

‘কেবল দু’টি বিষয়ে হিংসা করা যায়। এক. সেই ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন অতঃপর তা বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। দুই. সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফায়ছালা এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।[26]

ইলম হলো উত্তম জিহাদ

জিহাদের একটি প্রকার হল প্রমাণ ও দলিলের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা। দ্বীনের হেফাজতের জন্য এ জিহাদের বিকল্প নেই। এটি নবীর উত্তরাধিকারী নেতৃত্ববৃন্দের জিহাদ। মুখ ও হাতের জিহাদ থেকে এটির মর্যাদা মোটেও কম নয়। আর এই জিহাদের গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন

ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا

'আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতাম। সুতরাং তুমি কাফিরদের অনুগত্য করো না এবং তুমি কোরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর।(সূরা আল ফুরকান আয়াত 51- 52)

হযরত ইবনুল কাইয়ুম রাদিয়াল্লাহু বলেন, এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের সাহায্যে জিহাদ। জিহাদের প্রকারদ্বয়ের মধ্যে এটিই বড়। এটাকে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ বলা হয়।কারণ মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করত না। তারা দৃশ্যত মুসলমানদের সঙ্গেই থাকতো। এমন কি কখনো তারা মুসলিমদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিক হত। এতদাসত্বেও আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير-

'হে নবী কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হন ;তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। (সূরা আত তাহরিম আয়াত ০৯)

বলাবাহুল্য মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয় কোরআন ও প্রমাণের মাধ্যমে। সুতরাং এ জিহাদের মূল হাতিয়ার হল এলেম।

এজন্যই তো এলেম অন্বেষণকারী ও মুজাহিদ কে এক কাতারে রাখা হয় এবং উভয়কে বলা হয় আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ।যেমন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন -

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কেবল কোন কল্যাণ শেখার বা শেখানোর অভিপ্রায়ে আসবে, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী। আর যে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে সে ওই ব্যক্তির ন্যায় যে অন্যের সম্পদে পরিদর্শনে আসে।(ইবনে মাজাহ হাদিস নাম্বার ২২৭)

তালিবে ইলেমের মর্যাদা

ইলম বা জ্ঞান মানবজাতির প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও নিয়ামত। ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব অনেক বেশি। মুসলমানদের প্রতি প্রেরিত আসমানি গ্রন্থ কোরআনের প্রথম বার্তাই ‘ইকরা বা পড়ো’। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করো।

ইসলাম থেকে ইলম আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম জড়িয়ে আছে।

ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন—যেকোনো ক্ষেত্রেই ইলমের প্রয়োজন আছে।

এ জন্যই সর্বপ্রথম কোরআনে ইলমের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, “পড়ো! তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ থেকে। পড়ো! তোমার প্রতিপালক মহান, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।” (সুরা : আলাক, আয়াত : ১-৫)

ইলম প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘তিনি (আল্লাহ) মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও বর্ণনা শিখিয়েছেন।’ (সুরা : আর রহমান, আয়াত : ৩-৪)

মানবজাতি আশরাফুল মাখলুকাত নির্বাচিত হয়েছে মূলত জ্ঞানের কারণেই। অন্য সব প্রাণীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব-কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব যাই বলি না কেন, তা সম্ভব হয়েছে ইলমের মাধ্যমেই। ইলম অন্বেষণকারীকে হাদিসের ভাষায় বলা হয় ‘তালেবে ইলম’।

পরিভাষায়, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাসুল (সা.)-এর দেখানো তরিকায় জ্ঞান অর্জন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে তাকে তালেবে ইলম বলা হয়।’

তালেবে ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াত এসেছে। ইলম বা জ্ঞান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। কেউ চাইলেই ইলমের উত্তরাধিকার হতে পারে না। পারে না ইলম অন্বেষণকারী বা তালেবে ইলম হতে। এ জন্য খোদায়ি বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়। আর আল্লাহ তাকেই ইলমের জন্য মনোনীত করেন, যার জীবন দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দিয়ে ভরপুর করে দিতে চান। বুখারির বর্ণনায় রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বিনের সঠিক ইলম দান করেন।’ (বুখারি, হাদিস : ৭১)

তালেবে ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে অন্য হাদিস এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘তালেবে ইলমের জন্য সব কিছুই ইস্তিগফার করে। এমনকি আকাশের তারা, সমুদ্রের মাছও তার জন্য ক্ষমা চায়।’ (মুসনাদে আবি ইয়ালা : ২/২৬০)

ইলম অন্বেষণকারীর পায়ের নিচে নুরের পাখা বিছিয়ে দেওয়া হয়। সাফওয়ান (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এলাম। তখন তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে

বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি এসেছি ইলম অর্জনের জন্য। তিনি বলেন, 'তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয়ই তালেবে ইলমকে ফেরেশতারা ঘিরে রাখে এবং তাদের ডানা দিয়ে ছায়া দিতে থাকে। এরপর তারা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তারা তালেবে ইলমের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য করে।' (তাবারানি কাবির, হাদিস : ৭৩৪৭; মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাদিস : ৫৫০)

ফেরেশতারা শুধু তালেবে ইলমের সম্মানে নিজের ডানা প্রসারিত করে তাদের ছায়া দেওয়ায়ই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং হাদিসে আরো চমৎস্যর বর্ণনা এসেছে। হাদিসে বলা হয়েছে, তালেবে ইলমের মর্যাদা এত বেশি যে তারা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, ফেরেশতারা তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'অবশ্যই ফেরেশতারা তালেবে ইলমকে ভালোবাসে। তারা যখন রাস্তায় চলে ফেরেশতারা নিজের পাখা বিছিয়ে দেয়। তালেবে ইলমের জন্য সৃষ্টিকুলের সব কিছু দোয়া করতে থাকে। এমনকি আকাশের তারা, সমুদ্রের মাছ তাদের জন্য দোয়া করে।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২১৭১৫; জামে তিরমিজি, হাদিস : ২৬৮২)

মহান আল্লাহ আমাদের ইলম বৃদ্ধি করে দিন। আমিন।

ইলম মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ

ইলম হলো মানবজাতির প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং মহা নেয়ামত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন –

خلق الانسان علمه البيان

অর্থ্যাৎ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন।

মানবজাতির আশরাফুল মাখলুকাত খ্যাতির পিছনেই মূলতঃ ইলমের প্রধান ভুমিকা রয়েছে। মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব, অন্য সকল প্রানীর উপর কর্তৃত্ব, বিশ্বব্যাপি নেতৃত্ব এ সকল কেবল আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহ জ্ঞান তথা ইলমের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র মানবজাতিকে 'যুল আকল' তথা বিবেক সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতির বিবেক তখনই কল্যাণমূখী বিবেচিত হবে, যখন সেই আক্ল তথা বিবেক নামক মহা নেয়ামত ইলমের আলোয় আলোকিত হবে।

আশরাফুল মাখলুকাত খ্যাত মানবজাতির কতিপয় সদস্যের 'বিবেক' থাকা সত্ত্বে¡ও তারা বাস্তবিক ক্ষেত্রে মানবিক আচরণের বদলে পশু সুলভ আচরণ করে বসে। এর একমাত্র কারণ হলো তাদের 'বিবেক' নামক শ্রেষ্ঠ সম্পদটি ইলমের আলোয় আলোকিত হয়নি। এ কারনেই

তারা বিবেক থাকা সত্বেও বিবেকহীন কাজ করে বসে। এ জন্য দেখা যায় যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ইলম দান করেছেন তারা বিবেকহীন কাজ থেকে দুরে থেকে মানবতার অশেষ কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন, তারা ইলম শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে মানবতার স্তরে পৌঁছে দেন। এমনকি তারা অন্যান্য মাখলুকাতের প্রতিও সদয় আচরণ করেন।

এলমে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন হল আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ও রাসূলবর্গকে দেয়া এলেমকে আপন দান ও অনুগ্রহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ থেকেই এ দানের মহত্ব সহজেই অনুমেয়। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আপন অনুগ্রহ ও দানের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন -وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما

‘আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমাত এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। আর তোমার উপর আল্লাহর মহান অনুগ্রহ রয়েছে। (সূরা আন নিসা আয়াত ১১৩)

হযরত মূসা আলাইহিস ওয়া সাল্লামের প্রতি অনুগ্রহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন -
ولما بلغ أشده واستوى اعطيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

'আর মুসা যখন যৌবনে পদার্পণ করলো এবং পরিণত বয়স্ক হল, তখন আমি তাকে বিচার বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। (সূরা আল কাসাস- আয়াত 14)

ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস ওয়া সাল্লাম এর প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন -
اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك كتابه والحكمة والتوراة والإنجيل-

'হে মারিয়াম এর পুত্র ঈসা, তোমার উপর ও তোমার মাতার উপর আমার নিয়ামত স্মরণ কর ,যখন আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম পবিত্র আত্মা দিয়ে। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে দোলনায় ও পরিণত বয়সে। আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব ও হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল।(সূরা আল মাঈদা আয়াত- 110)

ইলমের কারণে আমলকারী প্রতিদান বাড়ে

ইলমের দ্বারা মুমিনের প্রতিদান বড় হয়। তার নিয়ত হয় পরিশুদ্ধ। ফলে সে নিজ আমল করতে পারে সুন্দর উপায়ে। মানুষ ইলমের চেয়ে মালের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। অথচ মালের চেয়ে ইলমের মর্যাদা অনেক বেশি। এ ব্যাপারে শরীয়ত আমাদেরকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। এদের মধ্যে দুই দল হবে নাজাত বা মুক্তিপ্রাপ্ত। তারা হলেন যারা ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। যেমন কাবশা আনমারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেন,

« ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ » قَالَ. « مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ » إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِى مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِى مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِى مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ ».

'তিন শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে আমি কসম করছি এবং তোমাদের কাছে একটি হাদীস বলছি, তোমরা তা সংরক্ষণ করো।' তিনি বলেন, দান-সদকায় কারো সম্পদ কমে না, কোনো ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করা হলে সে যদি তাতে ধৈর্য ধরে তবে আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন এবং কোনো বান্দা (মানুষের কাছে) প্রার্থনা বা চাওয়ার দরজা খুললে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা উন্মুক্ত করে দেন।' (বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা কিংবা) অনুরূপ বাক্য বলেছেন। আর আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বলব তোমরা তা স্মরণ রেখ। তিনি বলেন, 'দুনিয়া চার প্রকার লোকের জন্য; (১) সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ মাল ও জ্ঞান দান করেছেন। ফলে সে এতে তার প্রভুকে ভয় করছে এবং তার আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে আর তার ব্যাপারে আল্লাহর হক জানছে, এ হলো সর্বোত্তম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। (২) সেই বান্দা যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু মাল দেন নি। সে হলো সঠিক নিয়তের লোক। সে বলে, যদি আমার টাকা-পয়সা থাকতো তাহলে অমুক ব্যাক্তির মত কাজ করতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব পাবে। এদের দুজনের নেকী হবে সমান। (৩) আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ টাকা-পয়সা দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেন নি। সে না জেনেই তার টাকা-পয়সা খরচ করছে। এতে সে আল্লাহকে ভয় করে না, আত্মীয়তা রক্ষা করে না এবং এতে আল্লাহর হকও সে জানে না। সে হলো সবচে নিকৃষ্ট অবস্থানে। (৪) আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ মালও দেন নি জ্ঞানও

দেন নি, সে বলে আমার টাকা পয়সা থাকলে অমুকের মতই (খারাপ কাজ) করতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। এরা দুজনই গুনাহর দিক থেকে সমান।’ [তিরমিযী : ২৪৯৫] হাদীসটিতে আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃত ইলম বলেছেন ওই ইলমকে যা মানুষের সামনে বস্তুর স্বরূপ উদ্ভাসিত করে। সুতরাং ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি যদি ইলমের শোভায় অলংকৃত না হয় তবে সে সম্পদের অপব্যবহার করে। দেখা যায় সে তা ব্যয় করছে কুপ্রবৃত্তির লালসা পূরণে। এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না সে। এ কারণেই তাকে সবচে নিকৃষ্ট স্তরের বলে গণ্য করা হয়েছে। (আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।) পক্ষান্তরে একজন আলেম প্রকৃত সম্পদের মূল্য অনুধাবন করতে পারেন। তা কোথায় ব্যয় করা উচিত তা বুঝতে পারেন। ফলে তাঁর ইলমের বদৌলতে তিনি মহৎ নিয়ত করতে পারেন। সম্পদ না থাকলে তার নিয়ত করেও পারেন সর্বোত্তম মর্যাদা অর্জন করতে।

সূত্র-গুগল

কোরআনের ইলেম আলোকবিচ্ছুরণকারী নূর

আবু বকর সিরাজী

সম্পাদনা: আলী হাসান তৈয়ব

وَلَقَدۡ جِئۡنَٰهُم بِكِتَٰبٖ فَصَّلۡنَٰهُ عَلَىٰ عِلۡمٍ هُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٥٢ ﴾]الاعراف :٥٢[﴿

‘আর আমি তো তাদের নিকট এমন কিতাব নিয়ে এসেছি, যা আমি জেনেশুনে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তা হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ এমন জাতির জন্য, যারা ঈমান রাখে।’ {সূরা আল-‘আরাফ, আয়াত: ৫২}

আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত মুফাসসির মুহাম্মাদ আমিন শানকিতী (রহ.) বলেন,

ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار والرشد من الغي

‘সন্দেহ নেই যে, এই কুরআনই হচ্ছে সেই নূর, যা আল্লাহ তা‘আলা ভূপৃষ্ঠকে আলোকময় করতে অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সেই আলোর সাহায্যে হক ও বাতিল এবং ভালো ও মন্দ পার্থক্য করা যায়। ক্ষতি ও উপকারী বস্তু চেনা যায়। ভ্রান্তি থেকে সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায়।’

ইলমকে আল্লাহ মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ লেবাস বলে অভিহিত করেছেন। যথা-

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦ ﴾]الاعراف :٢٦[﴿

‘হে বনী আদম, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা সৌন্দর্যস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা উত্তম। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।’ {সূরা আল-‘আরাফ, আয়াত: ২৬}

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে লিবাস দ্বারা ইলম, রী-শা দ্বারা ইয়াকিন এবং লিবাসুত তাকওয়া দ্বারা লজ্জাশীলতা উদ্দেশ্য।

এসব আয়াত ছাড়াও আরো বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইলম ও ইলমের বাহকদের প্রশংসা করেছেন। সেই সঙ্গে মূর্খতা ও ইলমহীনতার নিন্দাও করেছেন কুরআনের বহু জায়গায়।৩

ইলম ও আমলে নূরানিয়াত ও গভীরতা আনার চেষ্টা করি

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

সময়ই হল যিন্দেগীর رأس المال বা মূলধন। সময় যাচ্ছে মানে আমার যিন্দেগীও শেষ হচ্ছে। তাই আকলমান্দের কাজ হল সময়ের সঠিক মূল্যায়ন। শুধু সময়ের অপচয় থেকে বেঁচে থাকা যথেষ্ট নয়, বরং আমাদেরকে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং তার إثمار ও إنتاج -ও করতে হবে। আর তা হতে পারে নিম্নোক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করলে–

যে কোনো কাজ আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার জন্য এবং কাজের মধ্যে নূর ও বরকত আনার জন্য প্রথম শর্তই হল নিয়ত সহীহ করা এবং নিজের মধ্যে ইখলাস পয়দা করা।

ইলম আল্লাহ তাআলার অতি গুরুত্বপূর্ণ মহা নিআমত। যাকে আল্লাহ তাআলা এ নিআমত দান করেন, তাকে তিনি বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। এই ইলম কেবলই আল্লাহর জন্য; অন্য কোনো কিছুর জন্য নয়। সুতরাং আমি ইলম অর্জন করব, যাতে আমি আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করতে পারি, তাঁর বিধিবিধান ও আদেশ-নিষেধ জানতে পারি, তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি বুঝতে পারি এবং সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর থাকতে পারি।

আমি ইলম অর্জন করব; কারণ ইলমের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বোঝার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। ইলমের মাধ্যমে নিজের ও অন্যের সব ধরনের জাহালাত ও মূর্খতা দূর করা যায়। কোন্টা হেদায়েত আর কোন্টা গোমরাহী তা পার্থক্য করা যায়। সর্বোপরি ইলম দ্বারা আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়।

দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ হাসিলের চিন্তা যেন আমার মাথায় না থাকে। হাদীস শরীফে এ বিষয়ে কঠিন ধমকি ও সতর্কবাণী রয়েছে।

অতএব একজন তালিবে ইলমের প্রথম কর্তব্য, নিজের মধ্যে ইখলাস পয়দা করা এবং নিয়ত সহীহ করা। সেইসঙ্গে নিয়তের তাজদীদ করতে থাকা। তাজদীদে নিয়তের একটি সহজ উপায় আমাদের মুরব্বিগণ বাতলে দিয়েছেন। উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী রাহ. (১৩৩৩ হি.-১৪২০ হি.) বলতেন, 'প্রতিদিন সকালে যখন কাজ শুরু করবে তখন নতুন করে নিয়ত বিশুদ্ধ করবে।' উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ

তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমও এই নসীহত করেছেন। ১৪৩০ ও ১৪৩১ হি.-এর বাংলাদেশ সফরে তিনি তালিবে ইলমদের খাস মজলিসে বলেছিলেন–

'প্রতিটি দিনের শুরু এভাবে করুন যে, সকালে অতি বিনয় ও কাতরতার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করবেন– হে আল্লাহ! আপনি দয়া করে আমাকে আরো একটি দিন দান করেছেন। হে আল্লাহ! এ দিনটিকে আপনার মর্জি মোতাবেক অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আমি নিয়ত করেছি, এই দিনটি আপনার মর্জি মোতাবেক কাটাব; আপনার কোনো নাফরমানী করব না। হে আল্লাহ আপনি তাওফীক দান করুন।'

নিয়ত সহীহ রাখার জন্য আরেকটি বিষয় জরুরি। তা হল, এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো সর্বদা স্মরণে থাকা চাই। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল–

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَالنَّارَ النَّارَ.

তোমরা ইলম এজন্য অর্জন করো না যে, এর মাধ্যমে তোমরা আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। –সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِه وَجْهُ اللهِ، لَا يَتَعَلَّمُه إِلَّا لِيُصِيبَ بِه عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে ইলম দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়, সে ইলম যে ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য লাভের আশায় অর্জন করবে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

আর ওই হাদীসটি তো খুবই প্রসিদ্ধ। তা হল, হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার করা হবে। তাদের একজন সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَه وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِه فَعَرَّفَه نِعَمَه فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُه وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِه فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِه حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

আরেক ব্যক্তি, যে ইলম শিখেছে, অন্যকে শিখিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে। তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নিআমতসমূহের কথা তার সামনে তুলে ধরবেন এবং সে সবগুলো স্বীকার করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি এতসব নিআমতের বিনিময়ে কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি আপনার জন্য ইলম শিখেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি ইলম শিখেছ, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয় এবং কুরআন পড়েছ, যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর তোমাকে তো দুনিয়াতে এরকম বলা হয়ে গেছে। তারপর আল্লাহ তাআলা ওর ব্যাপারে আদেশ

করবেন; তখন তাকে চেহারা মাটিতে হেঁচড়িয়ে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯০৫

ইলমের মজলিসই প্রকৃত সম্পদের মজলিস

দুনিয়ার মানুষ চোখে মোটা চশমার ফ্রেম পড়ায় দেখতে পায় না কোনটা মূল্যবান সম্পদ আর কোনটা মূল্যহীন এবং নগণ্য সম্পদ। এ কারণে পার্থিব জগতের সাফল্যকে বড় করে দেখে এবং আখিরাতের অফুরন্ত সম্পদ ও নিয়ামত ভুলে যায়। অথচ অফুরন্ত নিয়ামত অমূল্যবান সম্পদ হচ্ছে আখিরাতের সম্পদ। আর আখিরাতের নেয়ামত ও মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে এলেম। এ কারণে ইলমের মজলিসকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের মজলিস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে হাদিসের কিতাবে যেমন -
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু -একবার বাজারে গেলেন এবং লোকদের সম্বোধন করে বললেন তোমরা এখানো এখানে??অথচ মসজিদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাছ বন্টন হচ্ছে। তার কথায় লোকেরা বাজার ছেড়ে মসজিদের পানি ছুটে গেলেন। কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে দেখলেন কোথাও তাফসীরে মজলিস হচ্ছে কোথাও হাদিসের দরস হচ্ছে।ফলে তারা মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে দেখা হলে বললেন, আবু হুরায়রা!আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করুন। আমরা তো আপনার কথাই সত্যতা দেখতে পেলাম না।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তবে তোমরা সেখানে কি দেখছ?তারা বললেন আমরা একদল লোককে কোরআনের, আরেকদলকে হাদিসের দরসে লিপ্ত দেখলাম। আবু হুরায়রা রাঃ বললেন এটাই হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিরাছ।

মধ্যযুগে যেভাবে ইলমের মজলিস বসত

মধ্যযুগে ইলমি মজলিস বা জ্ঞানের আসর চিহ্নিত করার জন্য যে পরিভাষা সর্বাধিক ব্যবহৃত হতো, তা হলো ‘মজলিস’। যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একটি মজলিস অনুষ্ঠিত হতো, হয়তো তার নামেই মজলিসের নামকরণ হতো। উদাহরণস্বরূপ ‘মজলিসে মাহামিলির’ কথা বলা যায়। এটি মাহামিলির বাসগৃহে অনুষ্ঠিত হতো এবং এখানে মূলত ফিকহ ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হতো।

ইমাম শাফেঈ যখন বাগদাদ সফর করেন, তখন জামে মানসুরে ৪০ থেকে ৫০টির মতো হালাকা ছিল বলে উল্লেখিত হয়েছে। ৩২৬ হিজরিতে কায়রোর জামে আমরে মালেকি মাজহাবের ১৫টি, শাফেঈ মাজহাবের ১৪টি এবং হানাফি মাজহাবের তিনটি করে হালাকা ছিল। (আল-মুগরিব ফি হুলাল মাগরিব, পৃষ্ঠা ২৪)

কায়রো ও দামেস্কে নিয়মিত বৈঠকগুলোকে 'আজ-জাবিয়া' বলা হতো। জাবিয়াতে শাফেঈ, যেখানে তিনি সশরীরে দরস দিয়েছেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ওই নামে পরিচিত ছিল। কায়রোর মসজিদে আজহার এবং জামে মামুর, যেটিকে দামেস্কের গ্র্যান্ড মসজিদও বলা হয়, উভয়টিতে আটটি করে 'জাবিয়া' ছিল।

হাম্বলি মাজহাবের বিখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস আবু বকর নাজ্জাদ জামে মানসুরে দুটি হালাকার আয়োজন করতেন। শুক্রবার জুমার সালাতের আগে ফিকহি মাসআলার জন্য একটি, আর অন্যটি জুমার পর হাদিস বর্ণনার জন্য। (তারিখে বাগদাদ : ৪/১৯০)

একই শহরের জামে রুসাফাতে হাদিসের ছাত্রদের আরেকটি হালাকা বসত। বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আশআরি এখানে প্রতি শুক্রবার দরস দিতেন।

আসলে একটি হালাকায় কয়েকজন ওস্তাদ দরস দিতেন, আবার এটিও সম্ভব যে কয়েকজন ওস্তাদ কয়েকটি আলাদা হালাকায় অংশগ্রহণ করতেন। মজলিস ও হালাকার মধ্যে পার্থক্য ছিল বটে, তবে উভয়েরই মৃত শিক্ষকের নামে চেয়ার ছিল।

ছাত্রদের জন্য সাধারণত সব দরস উন্মুক্ত ছিল। তবে ব্যতিক্রম হতো সেসব বিষয়ে, যেগুলো শিখতে দীর্ঘ সময় লাগত। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে কিছু ছাত্রকে বাছাই করতেন এবং তাদের দরসে বসার অনুমতি দিতেন। আর যে বিষয় শেখানো হচ্ছে, সে অনুযায়ী ক্লাসের আকার ছোট-বড় হতো। ফলে ফিকহ বা ব্যাকরণের ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ছিল খুব সীমিত। কিন্তু হাদিসের ক্লাসগুলোতে উপস্থিতির সংখ্যা মাঝেমধ্যে এত বেশি হতো যে হাদিস বর্ণনার জন্য শিক্ষককে বর্ণনা সহকারী (মুসতামলি) নিয়োগ করতে হতো, যিনি শিক্ষকের বলা কথা একদম পেছনের সারিগুলোর উদ্দেশে আবার বলতেন, যেখান থেকে হয়তো শিক্ষকের কথা ঠিকমতো শোনা যায়নি। কায়রোর জামে আমরে আবুবকর নিআলির হালাকা এত বড় ছিল যে মসজিদের ১৭টি স্তম্ভজুড়ে ছাত্ররা বসত। (সুয়ুতি, হুসনুল মুহাযারা : ২/৯১)

হাদিসের পাঠ সম্পন্ন করার নির্ধারিত কোনো বয়স ছিল না। ছাত্ররা দীর্ঘ সময় ধরে সংকলনকার্য চালিয়ে যাবে, নাকি আগেভাগে বন্ধ করে দেবে, তা নির্ভর করত তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত দক্ষতার ওপর। তবে কতিপয় শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ভিন্নতর চিত্র দেখা যেত। ভাষাবিজ্ঞান ও ফিকহের ছাত্ররা একজন নির্দিষ্ট শিক্ষকের অধীনে বেশ লম্বা সময় ধরে পাঠ গ্রহণ করত। কথিত আছে, আহমাদ বিন ইয়াহইয়া সালাবের অন্যতম শিষ্য আবু মুসা আল-হামেজ তাঁর কাছে ৪০ বছর ধরে ইলম অর্জন করেছিলেন।

তাফসিরের একজন শিক্ষক ছয় বছর ধরে তাঁর কিতাবের দরস দিতেন।

প্রখ্যাত হানাফি ফকিহ আবু ইউসুফ ১৭ বছর ধরে তাঁর ওস্তাদ আবু হানিফার দরসে বসেছেন। আবু হানিফা নিজেও ১০ বছর ধরে তাঁর ওস্তাদ হাম্মাদ বিন আবু সুলায়মানের কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অবশেষে যে সময় বাগদাদ ও অন্যান্য জায়গায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলো, তত দিনে ফিকহশাস্ত্র চার বছরের একটি মানসম্মত কোর্সের রূপ পরিগ্রহ করেছে।
মাদরাসা-পূর্ব যুগের শিক্ষাব্যবস্থা এমন ছিল যে সেখানে ছাত্র-শিক্ষক কারো জন্য কোনো বয়সসীমা ছিল না। একজন যত দিন চাইত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারত। আবার যখন সে নিজেকে যোগ্য বলে মনে করত এবং ছাত্ররা তাকে ওস্তাদ হিসেবে গ্রহণ করত, তখন সে দরস দেওয়া শুরু করত। ১৭ বছরের এক তরুণ হাদিস বর্ণনার জন্য মজলিসের আয়োজন করেছিল। আরেকজনের বয়স ছিল ১৮, যখন হাদিসের ছাত্ররা তাকে দরস প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছিল।
তবে এটি সাধারণ চিত্র ছিল না। ওয়াকি ইবনুল জাররাহ ৩৩ বছর বয়সে হাদিস বর্ণনা করা শুরু করেন। এমনিভাবে ইবনে মাহদি যখন প্রথমবার পাঠদান করেন, তখন তাঁর বয়স ৩৫-ও হয়নি। (তারিখে বাগদাদ, ১৩/৪৬৮)

পৃথিবীর একটি বস্তুর চাহিদা সমাপ্তি নেই

পৃথিবীর সব বস্তু চাহিদা ও বাসনা একপর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। আকর্ষণ ও আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু এলেম এমন বস্তু যার আকর্ষণ ও চাহিদা কখনো নিঃশেষ হয় না। কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لا كتفي موسى عليه السلام ولكنه- قال للخضر عليه السلام):هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا

যদি হেলমেট চাহিদা শেষ হতে তবে সর্বপ্রথম মূসা আলাইহিআসাল্লাম এর চাহিদা শেষ হত। কিন্তু তিনি খিজির আলাইহিস সালাম কে বললেন- আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি? যাতে আপনি আমাকে এলেম শিক্ষা দেন ।
এলমের এই সীমাহীন মর্যাদা ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে সাহাবায়ে কেরাম তাদের প্রতিযোগিতার বিষয় বানিয়েছিল এলেম।আজ প্রার্থীব বস্তু সামগ্রী হাসিল করতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করি তারা সেসব করতেন না। কে কত বেশি আমল ও ইলিম হাসিল করতে পারেন তারা সেই প্রতিযোগিতাই করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ গ্রহণের আদেশ করেছেন।মা তবে আমাদের কি উচিত নয়, তাদের আদর্শ গ্রহণ করে এলমের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া??

এলেম মানসিক প্রশান্তির কারণ

আনন্দ ও মনের প্রফুল্লতা অর্জিত হয় এলমের মাধ্যমে। কেননা ইলম অস্পষ্টতা পর্দা উন্মোচন করে,হৃতগৌরব উদ্ধার করে, অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান উদ্ভাসিত করে, এবং সাফল্যের নতুন নতুন দার উন্মুক্ত করে। আর মানুষের আত্মা এসব বস্তু দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে মূর্খতা হচ্ছে লাঞ্ছনার নাম। মূর্খ এমন জীব যার প্রাণ নেই। চিন্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক কিছু নেই। তার জীবনের গতকাল এবং আজ সমান। আর আগামীকাল ব্যর্থতার গ্লানি তে কর্দমাক্ত। সুতরাং হে বন্ধু তুমি যদি সৌভাগ্যের পরশ পেতে চাও তবে এলম অন্বেষণ কর। তবেই দুশ্চিন্তা দূর হবে পেরেশান মুক্ত হবে।

ইলমের সামগ্রিক চিত্র ও হাকীকত

মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর এক হাদীছে ইলমের একটি সর্বাঙ্গীন চিত্র ও ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন,

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةً وَطَلَبَهُ عِبَادَةً، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ الْأُنْسُ فِي الْوَحْشَةِ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالسِّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخِلَّاءِ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً وَأَئِمَّةً يُقْتَصُّ آثَارُهُمْ، وَيُقْتَدَى بِأَفْعَالِهِمْ وَيُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ، تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خُلَّتِهِمْ وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَحِيتَانُ الْبَحْرِ وَهَوَامُّهُ وَسِبَاعُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ وَمَصَابِيحُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلَمِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ الْأَخْيَارِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ الصِّيَامَ وَمُدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ الْقِيَامَ، بِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ، وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ، وَهُوَ إِمَامٌ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ يُلْهَمُهُ السُّعَدَاءُ وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاءُ ، هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مَرْفُوعًا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ جِدًّا وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ قَوِيٌّ

'তোমরা ইলম শিক্ষা করো, কেননা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ইলম তলব করা আল্লাহভীতি এবং ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। ইলমের আলোচনা করা তাসবীহ এবং বাহাছ করা জিহাদের মতো। অজ্ঞকে শিক্ষা দেওয়া দান-সদকার মতো। যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বিতরণ করা নৈকট্য লাভের মাধ্যম। কেননা ইলম হচ্ছে হালাল-হারামের মাপকাঠি। জান্নাতীদের পথের আলো। ইলম একাকিত্বের সঙ্গী, নিঃসঙ্গতার বন্ধু, নির্জনতায় গল্পের সঙ্গী। সুখ-দুঃখের দলিল। শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র, বন্ধু-বান্ধবদের সামনে অলঙ্কার। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে একদল লোককে সম্মানিত করেন, ফলে তারা সমাজের নেতৃত্ব লাভ করে। তারা পথপ্রদর্শক হয়, যেই পথ অনুসরণ করে সাধারণ মানুষ পথ চলে। ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের আলোচনা করা হয় এবং ফেরেশতাগণ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাদের পায়ের নিচে নিজেদের পাখা বিছিয়ে

দেন। জীব-জড় এবং জলভাগ-স্থলভাগ সবশ্রেণীর মাখলুক ইলমওয়ালার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করেন। এমনকি সমুদ্রের মাছ এবং ভূমির কীটপতঙ্গ ও হিংস্র জন্তু-দানব! কেননা ইলম হচ্ছে মূর্খতা থেকে জীবন সঞ্চারণকারী। গভীর অন্ধকারের প্রখর উজ্জ্বল বাতি। ইলম বান্দাকে দুনিয়া-আখেরাতে মর্যাদার উচ্চ আসনে নিয়ে যায়। ইলম বিষয়ে ফিকির করা সাওম পালনের মতো। ইলমের দরস দেওয়া রাত্রি জাগরণ করে সালাত আদায় করার মতো। ইলমের দ্বারা আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এর দ্বারাই হালাল-হারামের সুস্পষ্ট জ্ঞান হাসিল হয়। ইলম হচ্ছে ইমাম এবং আমল হলো তার মুক্তাদী। ভাগ্যবানরা ইলম লাভে ধন্য হয় আর হতভাগ্যরা এ থেকে বঞ্চিত হয়।' [ইবন আবদুল বার (রহ.), জামে বয়ানুল ইলম, বর্ণনা নং ২৬৪]রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটেছিল একজন মুআল্লিম হিসেবে। তিনি ইরশাদ করেন

'আমি তো একজন শিক্ষক হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছি।' [ইবন মাজাহ: ২২৯]

ইলম অন্বেষণ অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে ফযীলতপূর্ণ

ইলম হাসিলের কাজে লিপ্ত থাকা নফল ইবাদতে মশগুল থাকার চেয়ে বেশি মর্যাদার। কেননা ইলম মানুষকে আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পন্থা শেখায়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ .أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ . وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ

'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেন, যে ব্যক্তি ইলম তলবের পথ গ্রহণ করে আমি তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিই। আর আমি যার উভয় চোখের দৃষ্টি কেড়ে নেই, তাকে উভয়ের বদলা দেব জান্নাতে। ইলম অন্বেষণের ফযীলত ইবাদতে লিপ্ত থাকার ফযীলতের চেয়ে বেশি। আর দীনের মূল হচ্ছে আল্লাহভীতি। [বায়হাকী: ৫৩৬৭, সহীহ]

ইলমের ফযীলত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের অভিব্যক্তি

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه

'একজন আলেম রোজাদার, তাহাজ্জুদের জন্য রাত্রি জাগরণকারী এবং আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের চেয়ে উত্তম। যখন একজন আলেম মারা যান যখন ইসলামের গায়ে একটি ছিদ্র ও দাগ পড়ে। যা অপরজন তার স্থান পূরণ না করার আগ পর্যন্ত ভরাট হয় না।' তিনি আরো বলেন,

العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يُكسِبُ العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزّان المال وهم أحياء

‘ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। কেননা ইলম তোমাকে পাহারা দেয় আর তুমি পাহারা দাও সম্পদকে। আলেম ব্যক্তির জীবনে ইলম নিয়ে আসে মানুষের আনুগত্য, আর মৃত্যুর পর তাকে সবাই উত্তমভাবে স্মরণ করে। আর মালের মালিক মারা গেলে মালও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। বরং, মালের মালিকরা জীবিত হলেও মৃত থেকে যায়।’

ইলম হাসিল হলে দুনিয়ার সব কিছু হাসিল হয়। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

خُيِّر سليمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه

‘সুলায়মান ইবন দাঊদ ‘আলাইহিমাসসালামকে ইলম, সম্পদ ও রাজত্ব- এই তিনটি বস্তুর যে কোনো একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। তিনি ইলম এখতিয়ার করেছিলেন। কিন্তু এর বদৌলতে সম্পদ ও রাজত্বও হাসিল হয়েছিল।’

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আহমাদ (রহ.) বলতেন,

تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها

‘রাতের কিছু অংশে ইলমের আলোচনা করা আমার কাছে সারারাত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার চেয়েও প্রিয়।’

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

يا أيها الناس عليكم بالعلم فإن لله سبحانه رداء يحبه فمن طلب بابا من العلم رداه الله عز وجل بردائه فإن أذنب ذنبا استعتبه ثلاث مرات لئلا يسلبه رداءه ذلك وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت

‘হে লোক সকল! তোমরা ইলম গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তা‘আলার একটি চাদর আছে, যা তিনি পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি ইলমের কোনো দরজা অন্বেষণ করে আল্লাহ তা‘আলা তাকে নিজ চাদরে আশ্রয় দেন। যদি সে কোনো গুনাহ করে, তাকে তিনবার এর শাস্তি থেকে সতর্ক করে যেন তার থেকে নিজ চাদর ছিনিয়ে নেওয়া না হয়। যদিও এ গুনাহ আমৃত্যু দীর্ঘায়িত হয়।’

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন,

ذللت طالبا فعززت مطلوبا

‘ইলম অন্বেষণের সময় তুচ্ছ থেকেছি ফলে উস্তাদ হয়ে সম্মানিত হয়েছি।’

আবূদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة

‘একটি মাসআলা শিক্ষা করা আমার দৃষ্টিতে ইবাদতের জন্য সারারাত জাগ্রত থাকার চেয়ে শ্রেয়।’

উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه

‘রাত্রি জাগরণকারী এবং সাওম পালনকারী এক হাজার আবেদের মৃত্যুর চেয়ে আল্লাহ তা‘আলার হালাল-হারামের জ্ঞান রাখা একজন আলেমের মৃত্যু অনেক বেশি ভারি।’

আবূদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আরো বলতেন,

من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله

‘যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হওয়াকে জিহাদ বলে মনে করে না তার চিন্তা ও বিবেকের ঘাটতি আছে।’

ইলমের প্রচারকের ফযীলত বর্ণনা করে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

من حدث حديثا فعمل به فله مثل أجر من عمل ذلك العمل

‘যে ব্যক্তি অন্যের কাছে একটি হাদীছ বর্ণনা করল আর সে ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করল তবে বর্ণনাকারীও সমপরিমাণ ছাওয়াব লাভ করবে।’

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন,

عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه موت رواته

‘ইলম উঠে যাওয়ার আগেই তা শিক্ষা কর। আর এর উঠে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাকারীর মৃত্যু ঘটা।’

আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কুমাইলকে লক্ষ্য করে বলতেন,

،يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق

‘হে কুমাইল! ইলম সম্পদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইলম তোমাকে পাহারা দেয় আর সম্পদকে তোমার পাহারা দিতে হয়। ইলম শাসক, পক্ষান্তরে সম্পদ প্রজা। সম্পদ খরচ করলে কমে যায় কিন্তু ইলম খরচ করলে তা বৃদ্ধি পায়।

বাতিলশক্তি খতম করতে ইলমী শক্তির প্রভাব

আল্লামা ইবন তাইমিয়া (রহ.) বলেন, বাতিল ও অপশক্তি বাহ্যিকভাবে প্রবল হলেও সহীহ ও ইলমে নাফের মোকাবেলায় তা নিতান্তই নগণ্য। আল্লাহ তা‘আলা ইলমের মধ্যে এমন এক শক্তি নিহিত রেখেছেন যার দ্বারা বাতিল শক্তিকে পরাভূত করা খুব সহজ। এমনকি বাহ্যিকদৃষ্টিতে বাতিলের শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যা বেশি অনুমিত হলেও। যেমন, মূসা (আ.)-এর ঘটনায় দেখা যায়, ফিরাউনের ভাড়া করা জাদুকর সংখ্যায় ছিল অনেক। কিন্তু নবুওয়াতী ও ইলমী শক্তির কাছে তারা খুবই দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়। এই সংখ্যা ইলমী শক্তিকে নিঃশেষ করতে চাইলে নিজেই নিঃশেষ হয়ে যায়! বাতিলশক্তি তাদের শক্তি প্রদর্শন করে অসংখ্য সাপ-বিচ্ছুর মহড়া দেখায়। কিন্তু মূসা (আ.)-এর ইলমী ও নবুওয়াতী শক্তির এক ঝলকে তা ধ্বংস ও মিসমার হয়ে যায়। এভাবেই রচিত হয়েছে ইতিহাস। যখনই কোনো বাতিলশক্তি ইলম ও আলেমদের পথচলায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করেছে তখনই তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। আজ তারা ইতিহাসের নিকৃষ্ট উপমা! ইলম ও আলেমদের চলার পথ কেউ কখনও বন্ধ করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ। এটাই আল্লাহ তা‘আলার ফয়সালা।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার সূর্য যখন অস্তগামী। বিদেশি বেনিয়া দের আগ্রাসনের শিকার যখন এদেশের মানুষ। আগ্রাসী শক্তির তৎপরতা প্রতিরোধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় যখন এদেশের অপামর জনসাধারণ। ভারতের অবস্থা যখন ধ্বংসের শেষ সীমানায় দন্ডায়মান। নামে মুসলিম রাজত্ব থাকলেও মুসলমান শাসনের প্রাণ বলতে কিছুই ছিল না। মুসলিম সম্রাট ছিল বটে কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিছু করার অধিকার ছিল না। আস্তে আস্তে ইংরেজদের শাসনের শোষণে পিষ্ট হতে লাগলো। নির্যাতন ও নিপীড়নের অবিনাশী ধাক্কায় ধুকে দুখে মৃত্যুর প্রহর গুণ ছিল পদ্মা, যমুনা, গঙ্গা, বিধৌত এই অঞ্চলটি।

উপমহাদেশের সূর্যসন্তান শাহ আব্দুল আজিজ যখন এ পরিস্থিতি অবলোকন করলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, দেশ সম্পূর্ণ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের করতলগত।তাই তিনি ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন দারুল হরব সুতরাং প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য হলো একে স্বাধীন করা। দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এ ফতোয়া। জ্বলে উঠল স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ের বহ্নিশিখা।সেই চেতনার ফল শ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের দারুল উলুম দেওবন্দ। যার সূর্যসন্তানেরা জীবন বাজী রেখে সর্বব্যাপীয় ও গণজাগরণের আত্মনিয়োগ করে।ক্রমান্বয়ে সঞ্জীবিত হয় স্বাধীনতার চেতনা, স্বাধীনতা আন্দোলন। ইংরেজ খেদাও আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনের কন্টক নয় পথ মাড়িয়ে আবার উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য। সরে যেতে তাকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা। এদেশের মানুষ ফিরে পায় তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পায় তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার পিছনে যে শক্তি কাজ করেছিল তা হল শাহ সাহেবের ঐতিহাসিক ফতোয়া। এভাবেই রচিত হয় ইতিহাস। যখনই কোন বাতিল শক্তি এলেম ও আলেমদের পথ চলায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করেছে তখনই তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। আজ তারা ইতিহাসের নিকৃষ্ট উপমা। ইলেম ও আলেমদের চলার পথ কেউ কখনো বন্ধ করতে পারবে না ইনশাল্লাহ এটাই আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা।

ইলম অর্জনের তিন শর্ত

হুমায়ুন কবীর

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য চমৎকার কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সুরা কাহাফের মধ্যেই রয়েছে এমন চারটি ঘটনা। আমরা সেখান থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করব। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেননি, বরং মূল পয়েন্টগুলো বলে দিয়েছেন। আর হাদিসে নবীজি (সা.) উম্মতের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, একদিন হজরত মুসা (আ.) বনি ইসরাইলের এক সভায় বক্তব্য দিচ্ছিলেন। বক্তব্য চলাকালীন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে? মুসা (আ.)-এর জানামতে ওই সময়ে তারচেয়ে অধিক জ্ঞানী আর

কেউ ছিলেন না। তিনি বললেন, আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের বিশেষভাবে গড়ে তোলেন।

তাই তাঁর এ জবাব আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেওয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ একথা বলা উচিত ছিল যে, এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। মুসা (আ.)-এর জবাবের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে তিরস্কার করে ওহি নাজিল হলো, 'দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।' এ কথা শুনে মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন সেই জ্ঞানী মানুষের সাহচর্য লাভের জন্য। বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে আপনি তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিন এবং দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন। মুসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর খাদেম ইউশা বিন নুন। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে একটি প্রস্তর খণ্ডের ওপর মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তায়ালা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। ইউশা বিন নুন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিলেন।

মুসা (আ.) ঘুমিয়ে ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা বিন নুন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন। এরপর সেখান থেকে সামনে রওনা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন-একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মুসা (আ.) তাকে বললেন, আমাদের খাবার নিয়ে আসো। আমরা সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খাবার চাওয়ার পরই ইউশা বিন নুনের মাছের ঘটনা মনে পড়ে গেল। তিনি ভুলে যাওয়ার ওজর পেশ করে বললেন, শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। তারপর বললেন, মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মুসা (আ.) বললেন, সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চললেন। প্রস্তর খণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন। মুসা (আ.) সালাম করলে খিজির (আ.) বললেন, এই নির্জন জায়গায় সালাম কোথা থেকে এলো? মুসা (আ.) বললেন, আমি মুসা। খিজির (আ.) জানতে চাইলেন, বনি ইসরাইলের মুসা?

তিনি বললেন হ্যাঁ, আমিই বনি ইসরাইলের মুসা। আমি আপনার থেকে ওই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। খিজির (আ.) বললেন, যদি আপনি

আমার সঙ্গে থাকতে চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার অবস্থা সম্পর্কে বলে না দেব।
এ কথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এলে তারা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা খিজিরকে চিনে ফেলল এবং কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদের নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিজির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে মুসা (আ.) চুপ থাকতে না পেরে বললেন, তারা কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদের নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? আপনি অতি মন্দ কাজ করেছেন।

খিজির বললেন, আমি আগেই বলেছিলাম আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মুসা (আ.) ওজর পেশ করে বললেন, আমি ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রাগ হবেন না। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, মুসা (আ.)-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল। তখন একটি পাখি উড়ে এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। খিজির (আ.) মুসা (আ.)-কে বললেন, আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ের মিলে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হয় না, যেমনটি এ পাখির চঞ্চুর পানির সঙ্গে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

তারপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিজির একটি বালককে অন্যান্য বালকের সঙ্গে খেলা করতে দেখলেন। খিজির বালকটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মারা গেল। মুসা (আ.) বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এটা অনেক বড় গুনাহের কাজ। খিজির বললেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মুসা (আ.) দেখলেন, এ ব্যাপারটি আগের চেয়েও গুরুতর। তাই বললেন, এরপর যদি কোনো প্রশ্ন করি তা হলে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। এরপর তারা আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। গ্রামবাসী সোজা অস্বীকার করে দিল। খিজির এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মুসা (আ.) বিস্মিত হয়ে বললেন, আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল। অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন, ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিজির বললেন, এখন শর্ত শেষ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর খিজির (আ.) উপরোক্ত ঘটনাগুলোর স্বরূপ মুসা (আ.)-এর নিকট বর্ণনা করে বললেন, এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ, যেগুলো আপনি দেখে ধৈর্য ধরতে পারেননি। রাসুলুল্লাহ (সা.) সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, মুসা (আ.) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরও কিছু জানা যেত (বুখারি : ১২২)। এই ঘটনায় আমরা খিজির (আ.)-এর তিনটি কাজ দেখতে পারি। এই কাজগুলোর ব্যাখ্যা এই হাদিসে রাসুল (সা.) করেননি।

কিন্তু অন্য হাদিসে এগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে। আমাদের যেহেতু ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য নয়, সুতরাং আমরা সেটা এখানে বলতে চাচ্ছি না। আমরা ঘটনার শিক্ষাটা উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। এই কুরআনিক ঘটনায় আমরা জ্ঞান অর্জনের তিনটা শর্ত খুঁজে পাই। আমরা এখান থেকে জানতে পারি, জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনটা শর্ত রয়েছে।

প্রথমত সফর, জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞানী মানুষের নিকট সফর করতে হবে। দ্বিতীয়ত সবুর, ধৈর্য ধরতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। তাড়াহুড়া জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তৃতীয়ত বিনয়, জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞানী মানুষের নিকট বিনয়ী হয়ে থাকতে হবে। নম্র হতে হবে। আমাদের সবার জীবনেই জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান ছাড়া দুনিয়ায় চলা অসম্ভব। আমরা সবাই জ্ঞান অর্জন করতে চাই। আমরা যদি আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শর্তগুলো মেনে চলি, তা হলে আমাদের জন্য জ্ঞান অর্জন করা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। সবুর, সফর ও বিনয়ের মাধ্যমে আমরা যেন জ্ঞান অর্জন করতে পারি, আল্লাহ তায়ালা সেই তওফিক দান করুন।

আলেম ও প্রাবন্ধিক

ইলমের সৌভাগ্য চিরস্থায়ী

আলেমের কদর ও সম্মান তার ব্যক্তিসত্তায় নিহিত। পক্ষান্তরে ধনীর সম্মান তার মালের মধ্যে নিহিত। ধনী ব্যক্তি তার সম্পদের মাধ্যমে মানুষকে দুনিয়ার দিকে আহ্বান করে। পক্ষান্তরে আলেম ইলমের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করে আখেরাতের দিকে।

ইলম মানুষের জীবনকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়জগতে কীভাবে উন্নতি বয়ে আনে তার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) উম্মতের মুহসিনগণের (কল্যাণকারী) একজন, যাদের অবদানের ভারে উম্মতের গর্দান সর্বদা নুয়ে থাকে। বিশেষ করে ফিকহে হানাফীর অনুসারীদের জন্য তার অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি শুধু একজন ফকীহ হিসেবেই ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর ইলম ও ফিকহ উম্মতের কাছে পৌঁছে দেন নি, বরং একজন প্রধান বিচারপতি হিসেবে ফিকহকে দর্শন থেকে বের করে এনে এর আমলী রূপও দান করেছেন।

আলী ইবন জা'দ (রহ.) বর্ণনা করেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বাল্যকালেই পিতা ইবরাহীম ইবন হাবীবের স্নেহ হারিয়েছিলেন। ফলে অভাবে অপরাগ হয়ে মা তাকে ধোপার কাছে ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর ঝোঁক ছিল প্রচণ্ড। তাই তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দরসে শরীক হতেন। মা এই তথ্য জেনে তাকে দরসে যেতে বাধা দিলেন এবং সে কারণে তিনি কয়েকদিন আবূ হানীফা (রহ.)-এর দরসে অনুপস্থিত থাকলেন।

মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্রের প্রতি উস্তাদদের আলাদা দৃষ্টি থাকে এবং সেটাই স্বাভাবিক। তাই কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকার পর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) দরসে উপস্থিত হলে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) আদ্যোপান্ত ঘটনা বলেন। ঘটনা শুনে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) দরস থেকে তাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং একশ দিরহামের একটি থলি হাতে তুলে দিলেন। দেওয়ার সময় বললেন, আপাতত এই দিয়ে প্রয়োজন পূরণ করো। ফুরিয়ে গেলে আমাকে জানাতে ভুল করো না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) বলেন, এরপর থেকে আমাকে কখনও বলতে হয়নি যে, আমার টাকা ফুরিয়ে গেছে। বরং টাকা ফুরিয়ে গেলে তিনি নিজ থেকেই আমাকে আবার টাকা দিতেন। যেন পয়সা শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি তিনি নিজ থেকেই আঁচ করতে পারতেন!

মা এটা জেনে ভাবলেন, এভাবে আর কতদিন চলবে? বরং একটা স্থায়ী সমাধান এবং জীবিকার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। একারণে একদিন তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, জনাব! এ তো ইয়াতিম বাচ্চা। আমি চাচ্ছি, সে কাজ শিখে জীবিকার স্থায়ী একটা ব্যবস্থা করে নিক, আপনি তাকে আপনার দরবারে উপস্থিত হতে বারণ করে দিন। মায়ের কথা শুনে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বললেন-

هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق

'সে তো ইলম শিক্ষা করে পেস্তার ঘিতে ফালুদা খাওয়া শিখছে!'

মা এটাকে নিছক কৌতুক মনে করলেন এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك

'আপনি বৃদ্ধ মানুষ। তাই আপনার আকল নষ্ট ও অকার্যকর হয়ে গেছে!'

কিন্তু কথাটির মর্ম ঠিকই বুঝেছিলেন ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই ইলমের বদৌলতে বিচারকের পদ দান করেছেন। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত খলীফা হারুনুর রশীদের দস্তরখানে খুব বেশি আমন্ত্রিত হতেন। তিনি বলেন,

فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون فالوذجة فقال لي يا يعقوب كل منها فليس في كل يوم يعمل لنا مثلها فقلت وما هذه يا أمير المؤمنين فقال هذه فالوذجة بدهن الفستق

'একবার আমি হারুনুর রশীদের দস্তরখানে বসা ছিলাম। এসময় তিনি আমার সামনে একটি পেয়ালায় পেস্তার ঘিতে বানানো ফালুদা পেশ করেন এবং বলেন, এটি একেবারেই খাঁটি বস্তু। হে ইয়াকুব! ভক্ষণ করুন। এগুলো সবসময় বানানো হয় না। বরং আমার জন্য মাঝে-মধ্যে প্রস্তুত করা হয়। আমি আশ্চর্য হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, আমীরুল মুমিনীন! এগুলো কী? তিনি জবাবে বললেন, পেস্তার ঘিয়ে ভাজা ফালুদা।

আমি তার কথায় হেসে উঠলাম। তিনি হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি পুরো ঘটনা ব্যক্ত করলাম। ঘটনা শুনে তিনিও অবাক হলেন এবং বললেন-

لعمري :إنه العلم ليرفع وينفع ديناً ودنيا وترحم على أبي حنيفة وقال :كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه

'আমার জীবনের শপথ! নিশ্চয় এই ইলম দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদা বুলন্দ করে।' এরপর তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর প্রতি রহমতের দু'আ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবূ হানীফাকে রহম করুন। তিনি সবকিছু অন্তর্চক্ষু দিয়ে অবলোকন করতেন, যা বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখা যায় না।' [ওয়াফায়াতুল আইয়ান ওয়া আবনাউয যামান: ৮/২২১]

ইলমের ফযীলত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের অভিব্যক্তি

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه
'একজন আলেম রোজাদার, তাহাজ্জুদের জন্য রাত্রি জাগরণকারী এবং আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের চেয়ে উত্তম। যখন একজন আলেম মারা যান যখন ইসলামের গায়ে একটি ছিদ্র ও দাগ পড়ে। যা অপরজন তার স্থান পূরণ না করার আগ পর্যন্ত ভরাট হয় না।' তিনি আরো বলেন,

العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يُكسِبُ العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزّان المال وهم أحياء

'ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। কেননা ইলম তোমাকে পাহারা দেয় আর তুমি পাহারা দাও সম্পদকে। আলেম ব্যক্তির জীবনে ইলম নিয়ে আসে মানুষের আনুগত্য, আর মৃত্যুর পর তাকে সবাই উত্তমভাবে স্মরণ করে। আর মালের মালিক মারা গেলে মালও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। বরং, মালের মালিকরা জীবিত হলেও মৃত থেকে যায়।'

ইলম হাসিল হলে দুনিয়ার সব কিছু হাসিল হয়। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

خُيِّر سليمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه

'সুলায়মান ইবন দাঊদ 'আলাইহিমাসসালামকে ইলম, সম্পদ ও রাজত্ব- এই তিনটি বস্তুর যে কোনো একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। তিনি ইলম এখতিয়ার করেছিলেন। কিন্তু এর বদৌলতে সম্পদ ও রাজত্বও হাসিল হয়েছিল।'

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং আহমাদ (রহ.) বলতেন,

تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها

'রাতের কিছু অংশে ইলমের আলোচনা করা আমার কাছে সারারাত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার চেয়েও প্রিয়।'

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

يا أيها الناس عليكم بالعلم فإن لله سبحانه رداء يحبه فمن طلب بابا من العلم رداه الله عز وجل بردائه فإن أذنب ذنبا استعتبه ثلاث مرات لئلا يسلبه رداءه ذلك وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت

‘হে লোক সকল! তোমরা ইলম গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তা‘আলার একটি চাদর আছে, যা তিনি পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি ইলমের কোনো দরজা অন্বেষণ করে আল্লাহ তা‘আলা তাকে নিজ চাদরে আশ্রয় দেন। যদি সে কোনো গুনাহ করে, তাকে তিনবার এর শাস্তি থেকে সতর্ক করে যেন তার থেকে নিজ চাদর ছিনিয়ে নেওয়া না হয়। যদিও এ গুনাহ আমৃত্যু দীর্ঘায়িত হয়।’

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন,

ذللت طالبا فعززت مطلوبا

‘ইলম অন্বেষণের সময় তুচ্ছ থেকেছি ফলে উস্তাদ হয়ে সম্মানিত হয়েছি।’

আবূদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة

‘একটি মাসআলা শিক্ষা করা আমার দৃষ্টিতে ইবাদতের জন্য সারারাত জাগ্রত থাকার চেয়ে শ্রেয়।’

উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه

‘রাত্রি জাগরণকারী এবং সাওম পালনকারী এক হাজার আবেদের মৃত্যুর চেয়ে আল্লাহ তা‘আলার হালাল-হারামের জ্ঞান রাখা একজন আলেমের মৃত্যু অনেক বেশি ভারি।’

আবূদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আরো বলতেন,

من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله

‘যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হওয়াকে জিহাদ বলে মনে করে না তার চিন্তা ও বিবেকের ঘাটতি আছে।’

ইলমের প্রচারকের ফযীলত বর্ণনা করে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

من حدث حديثا فعمل به فله مثل أجر من عمل ذلك العمل

‘যে ব্যক্তি অন্যের কাছে একটি হাদীছ বর্ণনা করল আর সে ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করল তবে বর্ণনাকারীও সমপরিমাণ ছাওয়াব লাভ করবে।’

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন,

عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه موت رواته

‘ইলম উঠে যাওয়ার আগেই তা শিক্ষা কর। আর এর উঠে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাকারীর মৃত্যু ঘটা।’

আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কুমাইলকে লক্ষ্য করে বলতেন,

،يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق

‘হে কুমাইল! ইলম সম্পদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইলম তোমাকে পাহারা দেয় আর সম্পদকে তোমার পাহারা দিতে হয়। ইলম শাসক, পক্ষান্তরে সম্পদ প্রজা। সম্পদ খরচ করলে কমে যায় কিন্তু ইলম খরচ করলে তা বৃদ্ধি পায়।’

উম্মতের সম্মানিত পূর্বসূরী আলেমগণের দৃষ্টিতে এলেম

ইমাম মালেক (রহ.)-এর বিখ্যাত শাগরেদ ইবন ওয়াহাব (রহ.) বলেন, ‘আমি একদিন ইমাম মালেক (রহ.)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। সে সময় মুআযযিন আযান দিলে আমি কিতাবপত্র গুছিয়ে সালাতের দিকে রওয়ানা হওয়ার উদ্যোগ করলাম। তখন ইমাম মালেক (রহ.) বললেন-

على رسلك !ترفَّق ليس الذي تقوم إليه – يعني من التنفل قبل الفريضة – بأفضل مما تقوم عنه إذا صحَّت النية

‘একটু দাঁড়াও। মনে রেখো, যে উদ্দেশ্যে (ফরযের পূর্বের নফল সালাত) যাচ্ছো, তা যা থেকে যাচ্ছো তা থেকে উত্তম নয়; যদি নিয়ত সহীহ থাকে।’

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

طلب العلم أفضل من النافلة

‘ইলম তলব করা নফল সালাতের চেয়ে উত্তম।’

পূর্বসূরীগণ ইলমকে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে আকীদা রাখতেন। শায়খ আব্দুর রহমান ইবন সাদী (রহ.) বলেন,

أن أهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله – تعالى – بتوقير العلماء وتعظيم حُرمتهم

‘আহলে সুন্নাত ওয়ালজামাত ওলামায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করতেন।’

হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

كانوا يقولون :موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار

‘পূর্বসূরীগণ এই বিশ্বাস রাখেন, একজন আলেমের মৃত্যু ইসলামের দেহ ছিদ্র হয়ে যাওয়ার ন্যায়। দিনরাতের পরিবর্তন যা ভরাট করতে পারে না।’

তিনি আরো বলতেন,

لموت قبيلة أيسر من موت عالم

‘একটি গোত্রের সকলের মৃত্যু একজন আলেমের মৃত্যুর চেয়ে অনেক সহজ।’

বিখ্যাত তাবে‘ঈ ইমাম যুহরী (রহ.) বলতেন,

ما عُبدَ الله بشيءٍ أفضلَ من العلم

‘ইলমের চেয়ে উত্তম কোনো ইবাদত নেই।’

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

من شرف العلم أن كل من نسب إليه ولو في شيء حقير فرح ومن رفع عنه حزن

‘ইলমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব এখানে যে, যার সঙ্গেই ইলম সম্পৃক্ত হয়-যদিও তা তুচ্ছ বিষয়ের ইলম হোক না কেন- আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হয়। আর যার থেকে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হয় সে পেরেশান হয়।’

আহনফ (রহ.) বলতেন,

كل عز ولم يؤيد بعلم فإلى ذل مصيره

‘যে ইজ্জত ইলমকেন্দ্রিক নয়, তার শেষ পরিণতি লাঞ্ছনা।’

সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলতেন,

لا أعلم بعد النُّبوة أفضل من العلم ، لأن العالم هو وريث النبي الخ

'নবুওয়াতের মর্যাদার পর ইলমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। কেননা আলেম হচ্ছেন নবীর ওয়ারিছ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের ওয়ারিছ বানান না বরং তারা ইলমের ওয়ারিছ বানান।'

আবূল আছওয়াদ (রহ.) বলেন,

ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك

'ইলমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো বস্তু নেই। বাদশারা তো সাধারণ মানুষের শাসক কিন্তু আলেমগণ বাদশাহদের শাসক।'

ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন,

الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء

'আমাদের দৃষ্টিতে মানুষ বলতে আলেমই বুঝায়। তারা ছাড়া অন্যরা কিছু নয়।'

সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলতেন,

لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة

'যদি একজন আলেম পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করেন তবে তিনিই বিশাল এক জামাতের মর্যাদা লাভ করবেন।'

আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল-

من الناس؟ فقال :العلماء قيل :فمن الملوك؟ قال :الزهاد .قيل :فمن السفلة؟ قال :الذين يأكلون الدنيا بالدين

'মানুষ কারা? তিনি জবাবে বললেন, ওলামায়ে কেরাম। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, বাদশাহ কারা? তিনি বললেন, দুনিয়াবিমুখ লোকেরা। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, আর নিকৃষ্ট লোক কারা? তিনি বললেন, যারা দীনের বদলায় দুনিয়া কামায় তারাই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।'

ইলমশুন্য মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মত

হাসান বসরী (রহ.) বলতেন,

لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم الخ

'যদি ওলামায়ে কেরাম না থাকতেন তবে মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর কাতারে নেমে যেত।' অর্থাৎ মানুষ কেবল ইলমের কারণেই চতুষ্পদ জন্তুর কাতার থেকে মানুষের কাতারে উন্নীত হতে সক্ষম হয়।'

বস্তুত অন্য যাবতীয় মাখলুক থেকে মানুষের আলাদা হওয়ার অবশ্যই কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর সেই বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে ইলম। মানুষ তো এ কারণেই মানুষ হয়েছে। সে তার ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থের কারণে জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে আলাদা ও মর্যাদাশীল নয়। যদি শারীরিক সামর্থ এবং কষ্ট সহিষ্ণুতার কারণে কেউ শ্রেষ্ঠ হতো উট সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতো। কেননা উট প্রাণীকুলের মধ্যে সবচেয়ে কষ্টসহিষ্ণু প্রাণী। শারীরিক কাঠামো ও বপুতার কারণেও

মানুষ শ্রেষ্ঠ নয়। যদি তাই হতো তবে স্থলভাগের হাতি এবং পানির তিমি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হতো। বাহাদুরি ও বীরত্বের কারণেও কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। যদি হতো তবে হিংস্র বাঘ সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতো। খাওয়ার সামর্থের কারণেও কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। যদি তাই হতো তবে গরু-মহিষ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতো। কেননা তাদের চেয়ে বড় পেট ও পেটুক কোনো প্রাণী নেই। সুতরাং অন্যান্য মাখলুকের ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একটি মাপকাঠি আছে। আর নিঃসন্দেহে সেটা হচ্ছে ইলম।

ইলমের বদৌলতে ইতর প্রাণীও সম্মানিত

ইলমের কারণে মানুষ তো বটেই, আল্লাহ তা'আলা ইতর প্রাণীকেও সম্মানিত করেছেন। শিকারের জ্ঞান রাখা কুকুরকে তিনি অন্যান্য কুকুরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٤ ﴾ [المائدة: ٤]

'তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী বৈধ করা হয়েছে? বল, 'তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সব ভাল বস্তু এবং শিকারী পশু-পাখী, যাদেরকে তোমরা শিকার প্রশিক্ষণ দিয়েছ; সেগুলোকে তোমরা শেখাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তা থেকে খাও, যা তোমাদের জন্য ধরে এনেছে এবং তাতে তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ কর আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।' {সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪}

এই আয়াত একথার প্রমাণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটা কুকুর অন্য কুকুর থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং ইতর প্রাণী কুকুর যদি ইলমের কারণে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হয় তবে মানুষ যদি এই ইলম অর্জন করে তবে সে অন্য মানুষের তুলনায় কতদূর এগিয়ে যেতে পারে?

ইলম মানসিক প্রশান্তির কারণ

পূর্বসূরীগণ বলেন,

إن السرور والانشراح ياتي مع العلم ، لأن العلم عثور على الغامض، وحصول على الضالة واكتشاف للمستور والنفس مولعة بمعرفة الجديد والاطلاع على المستطرف.أما الجهل فهو ملل وحزن ، لأنه حياة لا جديد فيها ولا طريف ، و لا مستعذب ، أمس كاليوم ، واليوم كالغد .فإن كنت تريد السعادة فاطلب العلم وحصل الفوائد، لتذهب عنك الغموم والهموم والأحزان.

'আনন্দ ও মনের প্রফুল্লতা অর্জিত হয় ইলমের মাধ্যমে। কেননা ইলম অস্পষ্টতার পর্দা উন্মোচন করে, হৃতগৌরব উদ্ধার করে, অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞান উদ্ভাসিত করে এবং সাফল্যের নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে। আর মানুষের আত্মা এসব বস্তু দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে মূর্খতা হচ্ছে লাঞ্ছনার নাম। মূর্খ এমন জীব যার প্রাণ নেই। চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক কিছু নেই। তার জীবনের গতকাল এবং আজ সমান। আর আগামীকাল ব্যর্থতার গ্লানিতে কর্দমাক্ত। সুতরাং হে বন্ধু! তুমি যদি সৌভাগ্যের পরশ পেতে চাও তবে ইলম অন্বেষণ কর। তবেই দুশ্চিন্তা দূর হবে, পেরেশানমুক্ত হবে।

এলমের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে করণীয়

আল্লাহ তা'আলা এলমের যে ইজ্জত ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন পার্থিব কোনো লালসায় পড়ে সেই ইজ্জতের সম্মান নষ্ট না করা চাই।দুনিয়াদার কোন লোকের কাছে বিনা কারণে কিংবা অত্যাবশ্যক কারণ ছাড়া আলেমের না যাওয়া উচিত। এমনকি দুনিয়াদার কোন লোককে এলেম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের ঘরে না যাওয়া চাই, যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাজা বাদশা হোন না কেন। বরং এলমের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে তাদেরকেই দরসগাহে আসতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা দরকার।

এক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) এ ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি জীবনে মোট চার বার বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। চতুর্থ সবচেয়ে বড় বিপত্তি ছিল এলমের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে। আর এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল তার জীবনের শেষ বয়সে। শেষ বয়সে তিনি বুখারাতেই বসবাস করছিলেন।সে সময় বুখারার আমীর ছিলেন খালেদ যুহলী।তিনি ইমাম বুখারী (রহ.) এর নিকটে এই মর্মের সংবাদ প্রেরণ করেন যে তিনি যেন ঘরে এসে তার সন্তানদেরকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেন। ইমাম বুখারী বললেন আমির ও বাদশাদের ঘরে ঘরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে আমি ইলমে হাদিসকে অপমানিত করতে চাই না।কেউ পড়তে চাইলে সে আমার কাছে এসে আমার দরসে শরিক হয়ে পড়ুক। আমি ফেরিওয়ালা নয় যে, এই এলেম নিয়ে বাদশাহদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবো!এটা এলমে নববীর মর্যাদার খেলাফ ।
তার জবাব পেয়ে আমীর দ্বিতীয় প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি বললেন, তাহলে আপনার দরসে একটা স্বতন্ত্র মজলিস কায়েম করা হোক। সেই মজলিসে কেবল আমার সন্তানেরাই লেখাপড়া করবে, অন্য কেউ তাতে শরিক হতে পারবেনা।
ইমাম বুখারী (রহ.) এই প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যান করলেন।তিনি বললেন, এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে,আমি অন্যদেরকে ইলম হাসিল করা থেকে বঞ্চিত করলাম কিংবা বাধা দিলাম।
আমির মনে করেছিলেন, অন্যদের সঙ্গে তার সন্তানদের লেখাপড়া তার জন্য অবমাননাকর। তাই তিনি আলাদা একটি মজলিস কায়েমের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু যারা একসঙ্গে বসে এলেম হাসিল করাকে অবমাননাকর ভাবে তাদের জন্য দরসে আলাদা মজলিস কায়েম করা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ দৃষ্টিতে চরম আপত্তিকর বলে মনে হল। ফলে তিনি এই প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হন। কিন্তু আমির খুব বেশি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ফলে বাধ্য হয়ে ইমাম বুখারী রহিমুল্লাহ বলেন, হ্যাঁ এক কাজ করা যেতে পারে। আপনি যদি এই মর্মে শাহী ফরমান জারি করেন যে, বুখারীর মজলিসে সাধারণ ছাত্ররা বসতে পারবে না তখন আমি অপারগ বিবচিত হবো এবং তখন বিষয়টি ভেবে দেখবো।হয়তো ওই সময় আপনার সন্তানের জন্য

আলাদা দরস কায়েম করা যেতে পারে।কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আম জলসার অনুমতি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কারো জন্য আলাদা মজলিস কায়েম করতে পারবোনা।

ইমাম বুখারী রহিমুল্লাহর এই প্রস্তাবে আমীর চরম নাখোশ হলেন এবং এর প্রতিশোধ নিতে তিনি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করলেন। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তার নামে তিনি নানা রকম মিথ্যা রচনা করতে থাকেন এবং হাজার রকম অপবাদ দেওয়া শুরু করেন। এভাবে তাকে বুখারা থেকে বের করে দেয়ার জোর তৎপরতা শুরু হয় এবং এসব ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ও মিথ্যা অপবাদ এর সূত্র ধরে এক পর্যায়ে তাকে বুখারা থেকে বের করে দেয়ার আদেশও জারি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই প্রিয় বান্দার বদদোয়া কার্যকর হতে সময় লাগেনি। ফলে স্বয়ং আমির খালেদই সীমাহীন অপদস্ত হন। খলিফা তাকে বরখাস্ত করেন এবং তার আদেশে গভর্নরকে গাধাই জড়িয়ে সারা শহর ঘুরানো হয়। ইসলামী ইতিহাসে এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা সন্ধান পাওয়া যায়।

কোরআন-হাদিসের বর্ণনায় আলেমদের সম্মান ও মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সম্মানিত করেছেন ওহির জ্ঞান ও জীবন-বিধান দিয়ে। সেই ওহির জ্ঞান ও বিধি-বিধান মানবজাতির কাছে পৌঁছানোর জন্য তিনি প্রেরণ করেছেন যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসুল। তাঁরা ছিলেন জগত্বাসীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় করুণা ও রহমতস্বরূপ।

আল্লাহর রহমতের সেই নবুয়তি ধারা আদম (আ.) থেকে শুরু হয়ে সমাপ্ত হয়েছে বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। তিনি শেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো নবী এই দুনিয়াতে আগমন করবেন না।

আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যদাতা : যুগে যুগে যাঁরা এই নবীদের জ্ঞান ধারণ করে আসছেন তাঁরাই যুগের হক্কানি উলামায়ে কেরাম।

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ আমাদের হাত পর্যন্ত পৌঁছেছে তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও অন্যান্য ইসলামী শাস্ত্রের সুবিন্যস্ত বিশাল বিশাল গ্রন্থাবলি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের বানিয়েছেন নিজ একত্ববাদের অন্যতম সাক্ষী। তিনি ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতারা এবং ন্যায়নিষ্ঠ আলেমরাও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।' (সুরা : আলে ইমরান : ১৮)

আলেমদের আনুগত্য : তাঁরা আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁদের কাছেই মানুষ লাভ করে কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞান। চিনতে নিজের প্রভুকে, শিখতে পারে আল্লাহর বিধি-বিধান। বুঝতে পারে শরিয়তকে। মানতে পারে হালাল-হারামকে।

তাঁদের মাধ্যমেই মানুষ খুঁজে পায় নিজের আসল পরিচয়। যাঁদের সংস্পর্শে এসে অন্ধকার জগতের মানুষগুলো সন্ধান পায় আলোকিত জীবনের। মৃত হৃদয়গুলো হয় পুনর্জীবিত। তাঁরা পৃথিবীর জন্য রহমত। তাঁরা উম্মতের জন্য বরকত। পরম হিতৈষী ও মঙ্গলকামী। আল-কোরআনে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের সঙ্গেই তাঁদের আনুগত্যেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, অনুসরণ করো রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বসম্পন্ন (ন্যায়পরায়ণ শাসক ও আলেম) তাদের। ' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৫৯)

আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা : আলেমদের কাছে ইসলাম সবার আগে। তাঁরা দ্বিনের অতন্দ্র প্রহরী। দ্বিন রক্ষার ঢাল ও সুদৃঢ় প্রাচীর। ইসলামের বিরুদ্ধে সব ধরনের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট। তাঁরা নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করে সব ধরনের বাতিল মতবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য সর্বদা অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যান। তাঁরা হক কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। হক প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জান-মাল ব্যয় করাটা গৌরব মনে করেন। বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করতে কালক্ষেপণ করেন না। তাঁদের হাতেই জিন্দা হয় সুন্নত। দূরীভূত হয় বিদআত। যেকোনো শরয়ি সমস্যা নিরসনে তাঁদের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ তাআলা নিজেই। তিনি ইরশাদ করেছেন, 'অতএব আলেম-জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো, যদি তোমাদের জানা না থাকে। ' (সুরা : নাহল : ৪৩)

হাদিসের আলোকে আলেমদের মর্যাদা : উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'ওই ব্যক্তি আমার আদর্শের ওপর নাই, যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করে না। ' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২২১৪৩, মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস : ৩৮৪)

আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'বৃদ্ধ মুসলমান, কোরআনের আদব রক্ষাকারী ও কোরআন অনুযায়ী আমলকারী হাফেজ এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর সম্মান করা মহান আল্লাহর সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। ' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪০৫৩)

আলেমরা আল্লাহর ওলি বা বন্ধু। তাঁদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করা আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করার শামিল। হাদিসে কুদসিতে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির সঙ্গে শত্রুতা করবে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। ' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৫০২)

আলেমদের সমালোচনার পরিণতি : ইমাম হাফেজ আবুল কাসেম ইবনে আসাকির (রহ.) বলেন, হে ভাই জেনে রাখো, উলামায়ে কেরামের দোষ চর্চা করা বিষাক্ত জিনিস। আল্লাহ তাআলার অভ্যাস হলো উলামায়ে কেরামের কুৎসা রটনাকারীকে তিনি লজ্জিত করেন (এটা কারো অজানা নয়)। যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের সমালোচনা করবে আল্লাহ তার মৃত্যুর আগে তার অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেবেন। (আত-তিবয়ান ফি আদাবে হামালাতিল কোরআন : ২৭-২৯)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) (৮৫২ হি.) বর্ণনা করেছেন, ইয়েমেনের বিখ্যাত মুহাদ্দিস কাজি ফকিহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ জাবিদি আশ-শাফেঈ (৭১০-৭৯২ হিজরি) যিনি ২৪ খণ্ড বিশিষ্ট ফিকহে শাফেঈর 'আত-তাফকিহ ফি শরহিত তানবিহ' নামক বিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থের রচয়িতা। মৃত্যুর সময় তাঁর চেহারা বিকৃত হয়ে যায়। এমন কি তাঁর জিহ্বা কালো হয়ে থুতনি পর্যন্ত বেরিয়ে যায়। উপস্থিত সবাই ধারণা করে তিনি জীবদ্দশায় ইমাম মুহিউদ্দীন নববী (রহ.)-এর অধিক সমালোচনা করার কারণে আজ তাঁর এ দুরবস্থা বরণ করতে হলো। (আদ্দুরারুল কামেনা : ৪/১০৬)

উলামা কেরামের প্রতি অবজ্ঞা করা এবং তাঁদের সঙ্গে উপহাস ও তাঁদের শানে বেআদবি করার প্রথম ফল হলো অন্তর মরে যাওয়া এবং এর সর্বশেষ পরিণাম অনেক ভয়াবহ। কেননা অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে যারা কোরআন-সুন্নাহ ও ইসলামের বিধি-বিধানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে তাদের বেশির ভাগের সূচনা হয়েছে কোরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহক উলামায়ে কেরামের সমালোচনা করা এবং অবজ্ঞা দিয়ে। কেননা কোরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহকদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও অবজ্ঞা করতে করতে তাদের অন্তর থেকে মূল কোরআন-সুন্নাহ ও ইসলামের প্রতি প্রকৃত মূল্যবোধ দূর হয়ে যায়। এভাবেই তারা ধীরে ধীরে সিরাতে মুস্তাকিম ও আবার কেউ একেবারে ইসলাম থেকেই সটকে পড়ে।

আলেমদেরকে গালি দেওয়ার শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গি : যেকোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া, বিদ্বেষী মনোভাব, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা নাজায়েজ ও ফাসেকি কাজ। সুতরাং উম্মতের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় উলামায়ে কেরামকে গালি দেওয়া, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা আরো জঘন্যতম কাজ তা বলাই বাহুল্য। আলেমের সঙ্গে দুশমনি ও গালি দেওয়ার কারণ দুটি হতে পারে। যথা—১. ব্যক্তিগত কোনো কারণে। ২. আলেম হওয়ার কারণে। কোনো আলেমকে আলেম হওয়ার কারণে গালি দেওয়া, তাঁর সঙ্গে শত্রুতা বা বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করা একটি কুফরি কাজ। এটি খুবই ভয়াবহ মানসিকতা। এমন মানসিকতা লালনকারী ব্যক্তি তাওবা না করলে ঈমানের সঙ্গে তার মৃত্যু হবে কি না ঘোর সন্দেহ আছে।

আল্লামা জাইনুদ্দিন ইবনে নুজাইম মিসরি (রহ.) (৯৭০ হি.) বলেন, যদি কেউ কোনো আলেম বা ফকিহকে ব্যক্তিগত কোনো কারণ ছাড়া (আলেম হওয়ার কারণে) গালি দেয়, তাহলে সে কাফির হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ' (আল-বাহরুর রায়েক : ৫/১৩২)

উলামায়ে কেরাম হলেন আম্বিয়া কেরামের ওয়ারিশ ও তাঁদের প্রতিনিধি। আল্লাহর তাআলা তাঁদের মনোনীত করেছেন দ্বিনের জন্য। তাই আলেমদের সঙ্গে বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করা, তাঁদের গালি দেওয়া পরোক্ষভাবে ইসলামের নিদর্শন অসম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।

আলেমের মর্যাদা

হাদিসের ভাষায় আলেমের মর্যাদা—

১. আলেমরা সম্মানিত

উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'ওই ব্যক্তি আমার আদর্শের ওপর নাই, যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করে না।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২২১৪৩)

২. আলেমরা নবীদের ওয়ারিশ

আল্লাহতায়ালার বান্দাদের মধ্যে প্রিয় হচ্ছেন নবীগণ। একজন সত্যিকারের আলেম নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে মর্যাদা পান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেমের মর্যাদা সম্পর্কে ইরশাদ করেন, 'আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী, আর নবীরা উত্তরাধিকার হিসেবে দিনার ও দিরহাম (অর্থকড়ি) রেখে যাননি। তারা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন ইলম। অতএব যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করেছে, সে বিপুল অংশ লাভ করেছে। (সুনানু আবী দাউদ, হাদিস: ৩৬৪৩)

৩. মৃত্যুর পরও আলেমের নেক আমল জারি থাকে

মানুষ মৃত্যুবরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আলেমের আমল জারি থাকে। একজন আলেম জীবিত অবস্থায় ইলম বিতরণ করার কারণে অনেকে উপকৃত হয়েছেন। সেজন্য মৃত্যুবরণ করার পরও তার সওয়াব তিনি পেতে থাকবেন।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহাবি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি উৎস থেকে তা অব্যাহত থাকে : সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম ও নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।' (সহীহ মুসলিম: ৪৩১০)

৪. সকল সৃষ্টি আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে

কুরআন-সুন্নাহর ইলমে সমৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য বড়ই সুসংবাদ যে, তার জন্য আল্লাহর নিকট সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ইলমের অধিকারী ব্যক্তির জন্য সব কিছুই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি সমুদ্রের মাছও।' (মুসনাদু আবী ইআ'লা: ২/২৬০)

আল্লাহতায়ালা আলেমদের শান ও মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন, কুরআনে বর্ণিত হয়েছে— আল্লাহ তায়ালা স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এবং ফেরেশতাগণ, আলেমগণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। (সুরা আলে ইমরান- ৩)

আল্লাহতায়ালা যাদের কে নিজ সত্তার সাথে, ফেরেশতাগণের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন তাদেরকে সম্মান করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক।

আলেমদের বিরুদ্ধাচারণের কুফল—

ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা ও মুসলমানদের বিশুদ্ধ পথে পরিচালনা করার জন্য যে আলেমরা নিজেদের সর্বস্ব কোরবান করেন তাদের প্রতি অবজ্ঞা বা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে, তাদের নিয়ে উপহাস বা ঠাট্টা করলে বা বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করলে এর পরিণতি হবে ভয়ংকর।

ইমাম ত্বহাবী রহ, তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল আকিদাতুত তহাবিয়্যা'য় লিখেছেন— পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম যারা হাদিস, ফিকহ ও দ্বীনি দূরদর্শীতাসম্পন্ন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতিত তাদের সমালোচনা করা জায়েজ নেই। যারা অন্যায়ভাবে তাদের সমালোচনা করবে তারা গোমরাহ হিসেবে গণ্য হবে। (আল আকিদাতুত ত্বহাবিয়্যাহ,,পৃষ্ঠা:১৪৫)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত: আলেমদের রক্ত বিষাক্ত। যে তার ঘ্রাণ নিবে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। যে তা ভক্ষণ করবে সে মারা যাবে।

আলেমদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করার নামান্তর। যে আলেমের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করে সে যেন স্বয়ং আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ লিপ্ত হল।

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন— 'যে আমার ওলির সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করল; পরিণামে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম।' (সহিহ বুখারি)

আলেমের প্রতি বিদ্রুপ করলে অন্তর মরে যায়। হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ.) বলেন—'যে ব্যক্তি আলেমের প্রতি বিদ্রুপাত্মক শব্দ ব্যবহার করে মৃত্যুর আগে তার অন্তর মরে যাবে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা মোরগকে গালি দিও না; কেননা সে প্রত্যুষে মানুষকে নামাজের জন্য জাগিয়ে তোলে।' (আবু দাউদ : ৫১০১)।

নামাজের জন্য ডাকার কারণে একটি সাধারণ মোরগের ব্যাপারে যখন এমন বলা হল, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী, নবীর উত্তরাধিকারী আলেমদের সম্মান ও মানহানি থেকে বিরত থাকা তো আরও অধিকতর গুরুত্বের দাবি রাখে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন— 'তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে। নিজেও সৎকর্ম করে এবং এও বলে যে, নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত।' (সুরা হা মীম সাজদা)

অতএব, ইসলামি বিধি-বিধানের প্রকৃত মূল্যবোধ বজায় ও জাগরিত রাখার জন্য আলেম-ওলামাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও আস্থাশীল হতে হবে। তাদের প্রতি মান্যতা থাকতে হবে। তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা যাবে না। বিরুদ্ধাচারণ করা যাবে না। কারণ, আলেমদের বিরোধিতা করা ইসলাম বিরোধী হওয়ার নামান্তর।

লেখক: তরুণ আলেম

তালিবে ইলমের বৈশিষ্ট্য

হাকীকী অর্থে তালিবে ইলম হতে পারা তো বহুত বড় সৌভাগ্যের বিষয়। আমি সে রকম তালিবে ইলম না হতে পারলেও আল্লাহ যে আমাকে তালিবে ইলমের মজমায় নিয়ে এসেছেন এবং বসার তাওফীক দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করি-

اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك).مسلم(

.اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لاشريك لك، فلك الحمد ولك الشكر (أبو داود)

اللهم إني أصبحت، أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك) .أبو داود(

শেষোক্ত দুআটি ফজরের পরে চারবার এবং মাগরিবের পরে চারবার পড়লে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে নাজাত দেবেন। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দুআগুলো মূলত ঈমান তাজা করার জন্য। তাওহীদের আকীদাকে মজবুত করার জন্য। আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ও তাফবীযের সিফাতকে যিন্দা ও তাজা করার জন্য। নেক আখলাকের ফিকির পয়দা হওয়া এবং বদ আখলাকের ওয়াসওয়াসা গায়েব হওয়ার জন্য। এসব সিফাত হাসিলের জন্য আদইয়ায়ে মা'ছুরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আমাদের উসতায ও মুরব্বীগণ তাকিদ করে থাকেন। অনেক দুআ আছে। সব না হোক, কিছু কিছু হোক, যার জন্য যেটা সহজ হয় নির্বাচন করে ইয়াদ করা। আর নিয়মিত আমল করতে থাকলে এমনিতেই ইয়াদ হয়ে যাবে।

আমি বলছিলাম, আল্লাহর রহমত ফযল ও করমে আমরা তালিবে ইলম। যদিও এই কথা বলতে ভয় হয়। কারণ তালিবে ইলমের যে হুকুক ও আদাব রয়েছে সেগুলো তো আসলে রক্ষা হয় না। এজন্য দাবি হিসেবে নয় বরং শোকর হিসেবে বলছি, আমরা তালিবে ইলম। এই দুআর সঙ্গে- হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হাকীকী তালিবে ইলম বানিয়ে দিন। মাদরাসার হাজিরী খাতায় আমাদের নাম তালিবে ইলম হিসেবে লিখিয়ে দিয়েছেন; অতএব ফেরেশতাদের খাতায়ও আমাদের নাম হাকীকী তালিবে ইলম হিসেবে লিখিয়ে দিন।

.اللهم أحيني طالب علم، وأمتني طالب علم،واحشرني في زمرة طلاب العلم

তালিবে ইলম কারা ছিলেন? আমাদের আকাবির ও আসলাফ ছিলেন হাকীকী তালিবে ইলম। আমাদেরকে তাঁদের পথ অনুসরণ করতে হবে। নিকটতম যামানার আকাবির এবং এখন আল্লাহ যাঁদের যিন্দা রেখেছেন সকলের অনুসরণ করতে হবে। যাঁদেরকে আল্লাহ যিন্দা রেখেছেন তাঁদের হায়াত দারায করুন এবং আফিয়াত-সালামাতের সঙ্গে রাখুন। আর যাঁরা তাশরীফ নিয়ে গেছেন আল্লাহ তাঁদের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দিন।

নিকটতম আকাবিরের মধ্যে হাকীকী তালিবে ইলম, যেমন খতীবে আযম হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব রাহ.। গতকাল একজনের নাম শুনে এলাম, বড় মুহাদ্দিস ছিলেন, মাওলানা মাসউদুল হক রাহ.। তাঁর শাগরিদরা বলতেন, আসমায়ে রিজাল সম্পর্কে তাঁর

জানাশোনা এত বেশি ছিল, মনে হত যেন সবাই তাঁর চাচাত-জ্যাঠাত ভাই। তাঁকে তুলনা করা হত মুফতী ফয়যুল্লাহ রাহ.-এর সঙ্গে। খতীবে আযম রাহ.-এর সঙ্গে। তিনি তো প্রায় খতীবে আযম রাহ.-এর মুআসির।

তালিবে ইলমের মধ্যে যে সিফাতগুলো থাকতে হয়। এক-দুই সিফাতওয়ালা তালিবে ইলমও তালিবে ইলম। কিন্তু ইলম সবচেয়ে বেশি নাফে হয় সেই তালিবে ইলমের, যার মধ্যে ওই সিফাতগুলো একসাথে পাওয়া যায়, যেগুলো আমাদের আকাবিরের মধ্যে সাধারণত একসাথে পাওয়া যেত।

যেমন তালিবে ইলমের একটা সিফাত হল হিফয। কুরআনের হিফয, হাদীসের হিফয এবং বুনিয়াদী মাসায়েল, বুনিয়াদী উসূল ও কাওয়ায়েদের হিফয। এটা তালিবে ইলমের একটা সিফাত। যেমন পুরো কুরআনে কারীম বা তার বড় অংশ অথবা উল্লেখযোগ্য অংশের হাফেয হওয়া। অনেকগুলো হাদীসের হাফেয হওয়া। এবং মুতুন- মুখতাসার যেসব মতন আছে সেগুলোর- কয়েকটির হাফেয হওয়া। এটা তালিবে ইলমের পুরনো সিফাত। এই যামানায় কমে গেছে। তারপরও মাশাআল্লাহ কমবেশি কিছু তালিবে ইলম আছে। ফিকিরমান্দ উসতাযগণ তাদেরকে মুতাওয়াজ্জিহ করলে বেশ কিছু মাহফুযাত তালিবে ইলমদেরও থাকে আল্লাহর রহমতে। কিছু কাওয়ায়েদ ইয়াদ থাকবে তালিবে ইলমদের। ইসতিলাহাত ইয়াদ থাকবে। যেমন আলআকীদাতুন নাসাফিয়া। ছোট্ট রিসালা। একেবারে শুরু থেকে না হোক, অন্তত-

والعالَم بجميع أجزائه مُحدَث، ...، والمُحدِث للعالَم هو الله تعالى.

এখান থেকে রিসালার শেষ পর্যন্ত। শরহে আকায়েদের কথা বলিনি। সেটা তো তাফতাযানী (৭১২ হি.-৭৯১ হি.) রাহ.-এর। সেটা একটু দীর্ঘ। আমি বলছি মতনটার কথা- 'মাতনুল আকীদাতিন নাসাফিয়্যাহ'। নাজমুদ্দীন উমর নাসাফী (৪৬১ হি.-৫৩৭ হি.) রাহ.-এর। অনেক বড় ব্যক্তি। ছাহেবে হেদায়ার (৫৯৩ হি.) উস্তায। হাজারেরও বেশি শায়েখ থেকে ইলম হাসিল করেছেন। সেই শায়েখগণের জীবনীর উপর কিতাব লিখেছেন। তাঁর আরো অনেক কারনামা আছে।

আলআকীদাতুন নাসাফিয়া ছোট্ট রিসালা। তালিবে ইলমরা এক বৈঠকেই ইয়াদ করে ফেলতে পারে। তাতে একটি কায়দা আছে-

النصوص على ظواهرها، والعدول عنها إلى معانٍ يدّعيها أهلُ الباطن إلحادٌ.

এটা তো একেবারে বুনিয়াদী কায়দা। যরূরিয়াতে দ্বীনের শীর্ষের কায়দা।

যাহোক তালিবে ইলমের একটি সিফাত হিফয। আরেকটা সিফাত ফাহম। এটা হিফযের সিফাত থেকে আরো বেশি জরুরি। এটা তালিবে ইলমের আহাম সিফাত। ফাহমটা সাফ ও সালীম হতে হবে। সাফ মানে, যার মধ্যে ইনগিলাক বা উক্দা নেই।

احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ.

উক্দা যেমন যবানে হয়, ফাহমেও হয়। কোনো ধরনের অস্পষ্টতা ও প্যাঁচ থাকবে না। এমন ফাহমকে বলে সাফ। হুজুররা অনেকসময় বলেন, ছেলেটার যেহেন সাফ। এই শব্দ আমরা অনেকসময় মাজাযান বলে ফেলি। উৎসাহ দেয়ার জন্য বলে ফেলি। অত গভীরভাবে চিন্তা না করেও বলে ফেলি। এমন হয়। কিন্তু যদি যথাযথ ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা কিন্তু অনেক দামি বিষয়। যেহেন সাফ মানে, এর যেহেনে খলত নেই, তাখলীত নেই। বুঝটা পরিষ্কার। খলতওয়ালা বুঝকে বুঝ বলে না। খলত করতে থাকলে তো সেটা ফাহম নয়। খলত করার মানেই হল বিষয়টা তার কাছে পরিষ্কার হয়নি। অতএব উকদা (عقدة) গলক (غلق) ও খলত (خلط) মুক্ত যে ফাহম তাকে বলা হয় সাফ ফাহম। উস্তাযগণ সেটারই চেষ্টা করেন; তালিবে ইলমের মধ্যে যেন ওই ফাহমটা এসে যায়। তখন বলা হবে, এর যেহেন সাফ। এর ফাহম পরিষ্কার।

আর ফাহমটা সালীম হওয়া। সালীম মানে সুস্থ। মুক্ত। কিসের থেকে মুক্ত? ভুল থেকে মুক্ত। অর্থাৎ যথাযথ বুঝেছে। বুঝের মধ্যে কোনো ভুলের মিশ্রণ নেই। ঠিক-ঠিক বুঝেছে।

ফাহম যার সালীম হয় সে কখনো গলত কথা, গলত চিন্তা ও গলত দাওয়াত গিলতে পারে না। ফাহমে সালীম একদিনে পয়দা হয় না। ধীরে ধীরে তৈরি হয়। ফাহম যার সালীম সে কোনো মুনকার কথা মুনকার চিন্তা গিলতে পারবে না। কোনো গলত-সলত দাওয়াত কেউ তাকে দেবে আর সে সেটা গিলে ফেলবে- এটা হতে পারে না।

আজকাল কওমী মাদরাসাগুলোতে নতুন কিছু চিন্তার দাওয়াত দেয়া হয়। কিছু বইয়ের মাধ্যমে কিংবা তাশকীল করে করে নতুন চিন্তার দাওয়াত দেয়া হয়। অনেকে গিলে ফেলেছে সেই দাওয়াত। তাদের ফাহম সালীম নয়, সেজন্য গিলে ফেলেছে। ফাহম সালীম হলে গলত দাওয়াত গিলতে পারত না। কোনো আজীব-গরীব দাওয়াত যদি একজন তালিবে ইলমের কাছে আসে, তার সুওয়াল পয়দা হতে হবে। একটা সুওয়াল হল-

أين الناس عنه؟

তুমি যে দাওয়াত নিয়ে এলে আমি তো কোনো হুযুরের মুখে এই দাওয়াত শুনি না, এতদিন তো শুনিনি, এখন তুমি এটা কোত্থেকে নিয়ে এলে?

এ কথা বাস্তব- কিছু বিষয় এমন আছে, যেগুলোর ব্যাপারে কিতাবে হাশিয়া বা নোট লেখা হয়-

والناس عنه غافلون.

ফাতাওয়া শামীতে আছে বিভিন্ন জায়গায়, আদ্দুররুল মুখতারেও আছে। একটা মাসআলা উল্লেখ করে বলেন-

والناس عنه غافلون.

এই বাস্তবতা আলহামদু লিল্লাহ আমাদের জানা আছে। এ কথাও ঠিক- কিছু মাসআলা এমন আছে الناس عنه غافلون। কিন্তু প্রশ্ন হল, الناس-এর ال কি ইসতিগরাকী? ইসতিগরাকী তো নয়। ইসতিগরাকী হলে তিনি কীভাবে তাম্বীহ করছেন? তিনি কি নাসের অন্তভুর্ক্ত নন? অবশ্যই। তাহলে তিনি কীভাবে বললেন ‘ওয়ান নাসু আনহু গাফিলূন?’ এটা ইসতিগরাকী নয়। এর দ্বারা

কিন্তু এটা যিনি বলছেন তার বলার মধ্যেও تجوّز আছে, توسّع আছে। তিনি যে ‘গাফিলূন’ বলছেন, কীসের ভিত্তিতে? সবার মতামত নিয়ে বলছেন? তা করেননি। তিনি এ বিষয়টার আম তাযকেরা দেখেন না, শোনেন না। অনেকের মাঝে আমলের ক্ষেত্রেও উদাসীনতা দেখেন। সে কারণে তিনি এ কথাটা বলেছেন। এটা দাওয়াতী ভাষা, ফিকহী ভাষা নয়। ফিকহের কিতাবে লিখছেন কথাটা কিন্তু ভাষাটা দাওয়াতী। অতএব একথা যেমন ঠিক, কিছু জিনিস এমন, যেগুলোর ব্যাপারে অনেকেই বেখবর, তেমনি এ কথাও ঠিক, যারা বা-খবর তারা তো এ সম্পর্কে বেখবর নন। যখন আমরা দেখি, বা-খবর যারা, তাদের ঠিকই এ সম্পর্কে খবর আছে তখন কিছু মানুষ বেখবর হওয়ার কারণে আমরা এই সহীহ বিষয়কে ইনকার করব না এবং এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করব না। والناس عنه غافلون বলেই তো তিনি থেমে যাননি, এর আগে তিনি তার দালায়েল উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তার কথার সিহ্হাত সাবেত হওয়ার পর এখন তিনি মাজাযান والناس عنه غافلون বাড়িয়ে বলে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। এরকম অবশ্য ঘটে যে, প্রমাণসিদ্ধ কিছু বিষয়ের ইলম কিছু মানুষের থাকে না। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি যেটা ঘটে- নতুন নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার করা হয়; আর সেসব নবআবিষ্কৃত বিষয়ের ইলম তো তাদেরই থাকবে, যারা এগুলো আবিষ্কার করেছে। যারা এসব গলত কথা আবিষ্কার করছে তারাই তো এগুলো জানবে; অন্যরা এ ব্যাপারে বেখবর থাকবে- এটাই তো স্বাভাবিক। যখন ফেতনার প্রচার শুরু হবে তখন তারা জানতে পারবেন- আচ্ছা এই ফেতনা হচ্ছে।

অতএব ওই ইবারতটা যেহেনে রাখতে হবে-

أين الناس عنه؟

এটা সালাফের কওল। ‘ওয়ান নাসু আনহু গাফিলূন’- এত পুরনো ইবারত নয়। বরং এই ইবারতটা পুরনো। যে কোনো নবআবিষ্কৃত চিন্তা, সালাফের চিন্তার সঙ্গে যার মিল নেই- এরকম চিন্তা বা কথা কেউ আবিষ্কার করলে তার উপর প্রথম প্রশ্ন সালাফ করতেন-

أين الناس عنه؟

অতএব এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। বর্তমানে যারা কওমী মাদরাসাগুলোতে বিভিন্ন গলত দাওয়াত প্রচার করে তারা এই প্রশ্ন করার আগেই জবাব দিয়ে দেয় যে, আমাদের আকাবির বিশেষ একটা পরিবেশে বড় হয়েছেন; তাদের এসব দিকে যেহেন যাওয়া জরুরি নয়। প্রশ্ন হল, আপনার আকাবির যে পরিবেশের আপনি তো সেই পরিবেশেরই। আপনার যেহেন ওই দিকে কীভাবে গেল? আপনার যেহেন যদি যেতে পারে তাহলে আকাবিরের যেহেনও যাবে। কিন্তু যায়নি কেন?

অতএব প্রথম ও সাধারণ একটা প্রশ্ন-

أين الناس عنه؟

কিন্তু এই প্রশ্ন তালিবে ইলমরা করে না। আরে, তুমি নতুন দাওয়াত গ্রহণ করছ এই প্রশ্ন না করেই?

নতুন দাওয়াত দুই প্রকার। একটা হল পুরনো জিনিসের নতুন দাওয়াত। আরেকটা হল দাওয়াতটাও নতুন, জিনিসটাও নতুন। দাওয়াতটাও নতুন জিনিসটাও নতুন- এটা দ্বীন নাকি? ফাহমে সালীম ওই ফাহম, যেটা শুযূয মুক্ত। যে ফাহমের মধ্যে এমন কোনো জিনিস মাখলুত হয়নি, যেটা শরীয়তের মেযাজ ও উম্মতের তাওয়ারুসের বিপরীত। যে ফাহম এমন জিনিস গ্রহণ করে না, তাকে বলে ফাহমে সালীম।

তালিবে ইলমের একটি আহাম সিফাত যেমন হিফয তেমনি আহাম একটি সিফাত হল ফাহম। ফাহমটা সাফ হওয়া এবং সালীম হওয়া। হিফয আর ফাহম এই দুইটার সমন্বয়ে তালিবে ইলম ধীরে ধীরে তারাক্কি করবে। এই দুই সিফাত আস্তে আস্তে তৈরি হয়। এই দুই সিফাত যত বাড়বে তালিবে ইলমের তত তারাক্কি হবে।

তালিবে ইলমের আরেকটি সিফাত ফিকরে আরজমান্দ। দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবিরের মধ্যে অনেক সিফাত আছে। এর মধ্যে দুইটি সিফাত বেশি মশহুর। ফিকরে আরজমান্দ ও দিলে দরদমান্দ। ফিকরে আরজমান্দ মানে আ'লা ফিকির। উৎকৃষ্ট ও সমুন্নত চিন্তা। স্থূল চিন্তা বা তুচ্ছ চিন্তা- এটা তালিবে ইলমের ভাবনা নয়। তালিবে ইলম ভাববে ভালোটা। যেখানে যেটা ভালো এবং যেখানে যেটা সুন্দর তালিবে ইলম সেটাই ভাববে। কোনো জিনিসের মূল্যায়ন বা তলবের ক্ষেত্রে ভাববে ভালোটা। যেটা ভালো, যেটা সুন্দর সেটা। তার ফিকির হবে ফিকরে আরজমান্দ, আ'লা ফিকর। সাতহী ফিকির নয়। তালিবে ইলমের ফিকির সাতহী হবে না। স্থূল হবে না। কথাগুলো একেবারে পরিচিত তালিবে ইলমদের কাছে; ইবারত হয়ত ভিন্ন হতে পারে। এখানকার মুরব্বীগণ কোন্ কথা কোন্ ইবারতে বলেন জানি না। সেজন্য কোনো এক ইবারতে বলছি। তবে কথাগুলো তালিবে ইলমদের কাছে পরিচিত।

মেছাল আসলে কথা সাফ হয়। তাই ছোট্ট একটা মেছাল দেই। আমরা অনেকসময় বাসে যাতায়াত করি। কখনো বাসে ভিড় থাকে। বাসে ভিড় দেখলে বিরক্ত লাগে কি না? বিরক্ত লাগে। অর্থাৎ অতিরিক্ত মানুষ দেখলে বিরক্ত লাগে। এত মানুষ কোত্থেকে এল? প্রশ্ন হল, অতিরিক্ত মানুষটা কে? অন্যরা, নাকি আমি? নিজের ব্যাপারে কিন্তু যেহেনে আসে না যে, আমি অতিরিক্ত। আমি না থাকলে অন্যরা আরো স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারত। নিজের ব্যাপারে এই ভাবনাটাই হল আ'লা ফিকির। পক্ষান্তরে আমিই মূল; আমি ছাড়া এত মানুষ উঠল কেন- এটা হল স্থূল চিন্তা।

একটা ঘটনা। একজন হুজুর সিএনজিতে যাচ্ছেন। সিএনজিতে সাধারণত পেছনে তিনজন বসে আর সামনে দুইজন। সব জায়গায় তো সামনে বসার ফযীলত নেই। সিএনজিতে পেছনের ফযীলত বেশি। এতে রাহাত ও ইকরাম বেশি হয়। পেছনে জায়গা না থাকলেই সামনে বসা হয়। কখনো এরূপ পরিস্থিতি দাঁড়ায় যে, পেছনের লোক সামনে যেতে হয়। তো এমন একটা হালত তৈরি হল যে, পেছনের একজনকে সরতে হবে। কথার কথা, একজন মুরব্বী আসলেন,

যার সামনে বসা কঠিন। তাহলে এখন একজনকে তো সামনে যেতে হবে। কিন্তু কে যাবে? এখানে তো সামনে বসার ফযীলত নেই; তাই কেউ সামনে যেতে চায় না। তবু একজন গিয়েছেন। যিনি গিয়েছেন তিনি সমঝদারির কাজ করেছেন তাই না? তিনি হলেন সেই হুজুর। তবে তার যেহেনে আসল, আমাকে যদি এরা চিনত তাহলে আমাকে আর সামনে পাঠাত না। তারা তো আর পাঠায়নি; উদ্দেশ্য হল, আমার যাওয়ার প্রয়োজন হত না; বরং তারাই সামনে চলে যেত আর আমাকে ইকরামের সঙ্গে পেছনে বসাত। এই চিন্তাটা স্থূল। সঠিক চিন্তা হল, আমাকে চেনে না- এ কারণেই তো আমি সিএনজিতে জায়গা পেয়েছি। বাস্তবেই যদি এরা আমাকে চিনত যে আমি কী, আমার ভেতরটা কী, তাহলে এতক্ষণ আমার সিএনজিতে বসে থাকারও সুযোগ হত না। এটা হল আ'লা চিন্তা। এটা যদি প্রথমে না এসে পরে আসে, তাহলেও আলহামদু লিল্লাহ। এরকম শত জিনিস আছে আমাদের চব্বিশ ঘণ্টার যিন্দেগীতে। একেক সময় একেক পরিস্থিতি আসে; সেগুলোকে আমরা দুইভাবে চিন্তা করতে পারি। একটা হবে স্থূল, আরেকটা হবে গভীর। তবে সব বিষয়েই তালিবে ইলমের ফিকিরটা হতে হবে আ'লা। সাতহী ফিকির হলে চলবে না।

এই যে মানুষ ভবিষ্যত নিয়ে ভাবে- এটাকে আপনি দুইভাবে চিন্তা করতে পারেন। এক ভবিষ্যত তো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। আরেক ভবিষ্যত হল মৃত্যুর পর থেকে। ভবিষ্যত নিয়ে ভাবা ভালো; কোনো আপত্তি নেই। এমনকি মওতের আগ পর্যন্ত যে ভবিষ্যত সেটা নিয়েও যদি তরীকামত ভাবে তাতেও আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু আমি মওতের পরের যে ভবিষ্যত এবং আসল যে ভবিষ্যত সেটা নিয়ে ভাবলাম না। কুরআন মাজীদে আছে-

وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.

প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। -সূরা হাশর (৫৯) : ১৮

আগামী দিনের জন্য ভাবছ, কিন্তু আসল আগামী দিনের জন্য কি ভাবছ? আসল ভবিষ্যতের জন্য ভাবা- এটা আ'লা চিন্তা। আর ফিকিরটাকে চোখের সামনের ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলাটা হল স্থূল চিন্তা। মোটকথা তালিবে ইলমের ফিকিরটা হতে হবে আ'লা ফিকির। আমি যা বলতে চেয়েছি, আশা করি সেটা পরিষ্কার হয়েছে। এটা কি নতুন কথা? পুরনো কথা। তালিবে ইলমের ফিকিরটা আ'লা হতে হবে। সবকিছুর মধ্যেই এই খেয়ালটা রাখতে হবে। স্থূল কোনো চিন্তা যেন আমার দিল-দেমাগে জায়গা না করতে পারে। আসা-যাওয়া করতে পারে। ওয়াসওয়াসা আসতে পারে। এতে সমস্যা নেই। মানুষ তো দুর্বল। কিন্তু স্থূল চিন্তা দিল-দেমাগে স্থির হয়ে যাবে এটা তালিবে ইলমের শান হতে পারে না। স্থূল চিন্তাকে দূর করতে হবে। তালিবে ইলমের চিন্তায় গভীরতা থাকতে হবে, উৎকর্ষের গুণ থাকতে হবে। এটা হল ফিকরে আরজমান্দ। ফিকরে আরজমান্দওয়ালা ব্যক্তিদের মধ্যে দিলের ব্যাধি থাকে না; আস্তে আস্তে সাফ হয়ে যায়।

অন্য কোনো তালিবে ইলমকে তারাক্কি করতে দেখলে আমার দিল সংকুচিত হবে, নাকি খোশ হবে? খোশ হবে। মুনাফাসাত ভালো জিনিস। কুরআনে আছে-

وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ.

এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। -সূরা তাতফীফ (৮৩) : ২৬

কে কার আগে যাবে, এটার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সব তালিবে ইলমের মধ্যে এই প্রতিযোগিতামূলক মেহনত থাকা চাই। এটা খুব ভালো। কিন্তু প্রতিযোগিতা হলে কেউ আগে কেউ পরে তো হবেই। কখনো বরাবরও হতে পারে। কিন্তু আমি যদি পিছে পড়ি, তাহলে আমি কি আমার উপর নারাজ হব, না যে তালিবে ইলম এগিয়ে গেছে তার উপর নারাজ হব? আমার উপর নারাজ হব। সে আগে যাওয়ার কারণে আমার মনে কষ্ট লাগলে সেটা স্থূল চিন্তা। আর আ'লা চিন্তা হল, হায়! আমি পিছে থেকে গেলাম। নিজেকে দোষ দেওয়া আর অন্যের ব্যাপারে খুশি হওয়া যে, মাশাআল্লাহ সে মেহনত করেছে, সে আগে গিয়েছে। মনে কষ্ট আসতে পারে -মানুষ তো- কিন্তু সেটাকে দূর করে ফেলতে হবে। আল্লাহর শোকর আদায় করা। বা-তাকাল্লুফ, মনে চাইছে না তবু বলেন, আলহামদু লিল্লাহ, খুশি হলাম আপনি আগে গিয়েছেন। মনে খুশি হননি তবু বলেন। তাহলে মনের এই দুর্বলতাটা দূর হয়ে যাবে। আর নিজেকে তিরস্কার করে বলবেন যে, আমি পেছনে পড়ে গেছি।

ফিকরে আরজমান্দ পুরো জিন্দেগীর বিষয়। জিন্দেগীর সকল শাখায় এটা কার্যকর। এটা আমাদের আকাবিরের শিআর। তালিবে ইলমের মাঝে এই সিফাত আস্তে আস্তে বাড়তে হবে। এই হল ফিকরে আরজমান্দ। আর দিলে দরদমান্দ সম্পর্কে বলা আসলে আমার যবানে সাজে না। ওগুলোও সাজে না, তারপরও একটা...। কিন্তু দিলে দরদমান্দ সম্পর্কে বাহার হাল এখানকার দিলওয়ালা হুজুর যারা আছেন, তাঁরাই বলবেন, বলে থাকেন এবং আরো বলবেন। এটা তালিবে ইলমের আরেকটা সিফাত।

কয়টা সিফাত বললাম? হিফয, ফাহম, ফিকরে আরজমান্দ এবং দিলে দরদমান্দ। তালিবে ইলমকে এসব সিফাত হাসিল করতে হবে।

যাইনুদ্দীন ইরাকী রাহ. (৭২৫ হি.-৮০৬ হি.) সম্পর্কে তাঁর উসতায জামালুদ্দীন ইসনাবী (الإسنوي) রাহ. (৭০৪ হি.-৭৭২ হি.) বলেছেন-

إن ذهنه صحيح، لا يقبل الخطأ.

অর্থাৎ তার যেহেন সাফ-সালীম। সে গলত কথা গিলতে পারে না। সুতরাং একজন গলত কথা বলবে আর তালিবে ইলম সেটা গিলে ফেলবে, একটু তাওয়াক্কুফও হবে না- এটা কেমন কথা। একটা গলত কথা, গলত চিন্তা, গলত দাওয়াত আসলে তালিবে ইলমের মধ্যে এই ভাবটা আসতে হবে যে, এটা কেমন কথা হল? আচ্ছা আমি হুজুরদেরকে জিজ্ঞেস করব। হুজুরদের সামনে পেশ করব। অথচ অনেকের এই অনুভূতিটাই নেই; বরং হুজুরদের থেকে দূরে রাখবে। বলবে, হুজুররা এসব বুঝবেন না। তারা পুরনো মানুষ। বেখবর মানুষ। তারা এসব বুঝবেন না। যারা একথা বলে, ওদেরকেই কিছুদিন পর তাদের ছাত্ররা একথা বলবে। তারা পুরনো

হওয়ার কারণে বেখবর হয়ে গেছেন, বুঝবেন না; তুমিও তো একদিন পুরনো হবে। তুমি কয়দিন আর জোয়ান থাকবে। কয়েকদিন পর তোমারও তো বয়স হবে। তখন তোমার শাগরিদরাও এই কথা বলবে। এগুলো হল আমারাতুল ফিতান। গলত দাওয়াতের আলামত। খাসিয়াত বলিনি। কোনো সহীহ কথাও কখনো কেউ এই শিরোনামে পেশ করে। করা উচিত নয়। কিন্তু এটা যে গলত দাওয়াতের একটা আলামত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আকাবিরের ব্যাপারে বদগুমানি পয়দা করা ও বদ যবানি করা এটা ফেতনার আলামত। ওই দাওয়াতকে যদি তুমি শরীয়তের আদিল্লা ও কাওয়ায়েদে শরীয়তের আলোকে বিশ্লেষণ কর, দেখবে ওটা গলত। সহীহ দাওয়াতওয়ালা সাধারণত এরকম শিরোনাম গ্রহণ করে না। কখনো জযবা এসে গেলে কেউ করে, কিন্তু সেটা মুকতাদা হয় না। গলত দাওয়াতই সাধারণত এই পোষাকে আসে।

চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের কট্টর সালাফী ও সাহাবা বিদ্বেষীদের কিছু নযরিয়া, সাধারণ সালাফীরা যেটাকে গ্রহণ করে না, সেগুলোকে কওমী মাদরাসায় ঢুকাচ্ছে কিছু লোক; তাহকীকের নামে, ইলমের নামে। এগুলো এদের আবিষ্কার নয়। নেটে ঢুকে মাওয়াদ-তোহফা এনে সেগুলো বিতরণ করে।

ليس من كدِّه ولا من كدِّ أبيه.

এগুলো তাদের মেহনত নয়। এগুলো আল্লাহর রহমতে আমরা অনেক আগে দেখেছি এবং দেখে রেখে দিয়েছি। এগুলো প্রচারযোগ্য নয়। এই আফকার ইশাআতযোগ্য নয়। সেই আফকার এখন তারা মুজাদ্দিদ সেজে, মুজতাহিদ সেজে প্রচার করছে। তালিবে ইলমের ফাহম যদি সালীম হয় তাহলে সে এই দাওয়াত কবুল করতে পারে না।

যাইহোক, তালিবে ইলমের অনেক সিফাত। আজকে এই চারটাই থাকল। ফাহম, হিফয, ফিকরে আরজমান্দ এবং দিলে দরদমান্দ। আল্লাহ তাআলা এই চারটা সিফাত এবং তালিবে ইলমের অন্যান্য সিফাত আমাদেরকে নসীব করুন- আমীন।

লেখা মাসিক আলকাউসার

প্রিয় তালিবানে ইলম!

বিনয় আদব ও ইলমী নিমগ্নতা শিখুন

নিজের বর্তমান যিম্মাদারীর প্রতি মনযোগী হোন

সাধ্যাতীত কাজের ফিকিরে পড়ে সাধ্যের ভেতরের কাজ থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

তলাবায়ে কেরামের খেদমতে আরয করার মত অনেক বিষয় আমার মুযাককিরায় লেখা আছে। এ শিরোনামটিও অনেক পুরনো; কিন্তু বর্তমান অবস্থা দেখে বলা যায়, এটি একেবারে সাম্প্রতিক একটি বিষয়।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

আপনাদের সামনে আমি সাফ সাফ আরজ করতে চাই যেÑ

ترسم نہ رسی بہ کعبہ اے اعرابی
کہ ایں راہ کہ تو می روی بترکستان است

আপনি যে পথে চলছেন তা আপনার পূর্বসূরি সালাফ-আকাবিরের পথ নয়। আপনার চলার পথ হলÑ

১. আসাতেযায়ে কেরামের সাথে আদব ও তাওয়াযুপূর্ণ আচরণ করা।

২. মাদরাসার নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলা।

৩. মাদরাসার ইন্তেযামী ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয়াবলিতে দখল না দেওয়া।

৪. স্ট্রাইক বা এ ধরনের যে কোনো কার্যকলাপ থেকে যোজন যোজন দূরে থাকা।

৫. রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক, নামধারী বা বেনামী, অজ্ঞাত বা গোপন যে কোনো ধরনের তানযীম বা সংগঠনের সাথে যুক্ত না হওয়া।

৬. তলবে ইলমীর যামানায় সক্রিয় রাজনীতিতে না জড়ানো।

৭. কোনো মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার অর্থই হল, মাদরাসার নিয়ম-কানুন এবং মাদরাসা কতৃর্পক্ষের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা আমার উপর ফরয।

৮. কোন্ কাজ ‘নাহি আনিল মুনকার’-এর অন্তভুর্ক্ত আর কোন্ কাজ ‘নাহি আনিল মুনকার’ নয়; কোন্ নাহি আনিল মুনকার তালিবে ইলমের দায়িত্বের মাঝে পড়ে আর কোন্টা তার দায়িত্বের মাঝে পড়ে না এবং কোন্ নাহি আনিল মুনকারে শামিল হওয়া তালিবে ইলমের জন্য স্পষ্ট নাজায়েযÑ এসব বিষয়ে যদি মাদরাসা কতৃর্পক্ষের (যারা আমাদের বড় এবং উসতায ও মুরব্বীও) ফয়সালা আর তালিবে ইলমের খেয়ালের সাথে মতবিরোধ হয় তাহলে অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও আদব ও তাওয়াযুর সাথে কতৃর্পক্ষ ও আসাতেযায়ে কেরামের ফয়সালা মত আমল করা কর্তব্য। ইজমায়ে মুতাওয়াতির এবং কাতইয়্যুছ ছুবুত ও কাতইয়্যুদ দালালাহ শরয়ী নছ ছাড়া এক্ষেত্রে তলাবাদের জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করার অধিকার নেই।

৯. তলাবায়ে কেরামের আসল কাজ হল তালীম-তরবিয়তে নিমগ্ন থাকা এবং নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টায় মগ্ন থাকা।

১০. সকল প্রকার অনর্থক কাজ ও অন্যায় দখল-আন্দাজি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

আশ্চর্যের শেষ থাকে না, যখন শুনিÑ কাদামাত ও আদব-তাওয়াযুর পতাকাবাহী মাদরাসার তালিবে ইলমরা আজকাল আসাতেযা ও মাদরাসা কতৃর্পক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে; তাও আবার পরীক্ষা চলাকালে। আর তা এমন এক বিষয়ে, যার শরয়ী বিধান কী তা হয়ত না তাদের জানা আছে, না তাদের গুরুদের।

‘ইলমী মাশগালা’-ই তালিবে ইলমের আসল মাশগালা

১. প্রথম কথা, যা সবসময় স্মৃতি ও উপলব্ধিতে জাগরূক থাকা উচিত। তা এই যে, তালিবে ইলমের প্রধান ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা হচ্ছে ইলমের তলব ও আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া। সে মাদরাসায় এসেছে তালীম-তরবিয়ত হাসিল করার জন্য; দ্বীনের সঠিক বুঝ হাসিল করার জন্য এবং আদব ও আখলাকের আমলী মশক গ্রহণ করার জন্য। ‘দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা’-বিষয়ক যেসব কর্ম ও বিধান শরীয়তে আছে, সেগুলো অবশ্যই সে জানবে এবং খুব ভালো করে বুঝবে, কিন্তু তলবে ইলমের প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থায়, বিশেষ করে মাদরাসি নেযামে থাকা অবস্থায় এসব কাজে সম্পৃক্ত হবে না। এমনকি শরীয়তের দৃষ্টিতেও এসময় সে এজাতীয় কাজের মুকাল্লাফ নয়। হাঁ, যদি তরবিয়ত বা মশকের অংশ হিসেবে দাওয়াত ও নসীহতের কোনো কাজ মাদরাসার নেযাম বা কর্মসূচিরই অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

২. কোনো কোনো তালিবে ইলমের মনে এ চিন্তা বেশ বদ্ধমূল যে, সিয়াসাত হল ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা; তাতে আমারও অংশগ্রহণ করা উচিত। সেজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ইসলামী দল ও সংগঠনের সাথে আমাকেও শরিক হতে হবে।

কিন্তু তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যে ‘সিয়াসাত’ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শাখা সেটা হচ্ছে ‘সিয়াসাতুর রায়িয়্যাহ’ (سياسة الرعية) অর্থাৎ জনগণের দ্বীন-দুনিয়া দুরস্ত করা ও দুরস্ত রাখা, রাষ্ট্রীয় সকল কাজকর্ম আল্লাহ তাআলার হুকুম মুতাবেক করা, মানুষের মাঝে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের ‘আহকামুল জিনায়াত’ বা দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা, এভাবে ইসলামের অন্যান্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান, নাহি আনিল মুনকার, ইহতিসাব এবং সামর্থ্য অনুযায়ী জিহাদ ইত্যাদি শাখাগুলো বাস্তবায়ন করা। আর একথা তো স্পষ্ট যে, এই অর্থে ‘সিয়াসাত’ হচ্ছে ‘সায়িস’ বা শাসকের কাজ, যার কাছে জনগণকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করার মতো শক্তি আছে। সাধারণ জনগণ তো ‘সায়িস’ (سائس) নয়, ‘মাসূস’ অর্থাৎ পরিচালক নয়, পরিচালিত; কর্তা নয়, অধীনস্ত।

যদি কোনো শাসক রাষ্ট্রে আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে সেক্যুলার শাসনপদ্ধতি অনুসরণ করে তাহলে তাকে আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রচালনার দাওয়াত দেওয়া এবং এ উদ্দেশ্যে শরীয়তসম্মত সমকালীন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা আর যাই হোক না কেন এগুলো ভিন্ন কাজ। এগুলোকে ‘সিয়াসাত’ নাম দেওয়া একটি নতুন পরিভাষা। অন্যথায় বাস্তবতা হল, এসব কাজ যদি শরীয়তের বিধান অনুসারে করা হয় তাহলে নাহি আনিল মুনকার এবং ‘ইযহারে কালিমায়ে হক’-জাতীয় দ্বীনী কাজের অন্তর্ভুক্ত; সিয়াসাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা শরয়ী সিয়াসাতের মুকাল্লাফ তো রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক, প্রজা বা জনগণ নয়। অতএব যে সায়িস বা শাসক নয় সে কীভাবে ‘সিয়াসাত’ করবে?[১]

এ সংক্ষিপ্ত কথাগুলো যদি বুঝে আসে তাহলে ইনশাআল্লাহ একথা বুঝতেও কোনো অসুবিধা হবে না যে, তালিবে ইলম কোনো বিচারেই সিয়াসাতের মুকাল্লাফ নয়। মূল অর্থে নয় এজন্য যে, সে প্রজা, শাসক নয়; আর সমকালীন অর্থেও এজন্য নয় যে, তার কর্তব্য হল ইলম ও আমলের সাধনায় আত্মনিমগ্নতা। দেশ ও সমাজপর্যায়ের 'নাহি আনিল মুনকার'-শ্রেণির কাজগুলো তার এখনকার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এর একটি তাৎপর্য এই যে, তাবলীগে দ্বীন ও নুসরতে দ্বীনের যত শাখা এবং যত রকমের কাজ ও উদ্যোগ রয়েছে সেগুলোকে সফল ও কল্যাণকররূপে আঞ্জাম দেয়ার জন্যও তো বিশুদ্ধ ইলম, গভীর প্রজ্ঞা এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিপক্ক দ্বীনী সমঝ অপরিহার্য প্রয়োজন। আর তালিবে ইলমের শিক্ষাজীবন হচ্ছে মূলত সেগুলো অর্জন করারই মূল সময়। সেজন্য তার মধ্যে মেধা, চিন্তা ও কর্মশক্তির বিক্ষিপ্ততা আদৌ কাম্য নয়, কাম্য হল নিমগ্নতা ও একাগ্রতা। এ বিষয়ে সকল যুগের তালীম তারবিয়াতের চিন্তাশীল উলামায়ে কেরাম একমত। আমাদের সালাফ-খালাফের সকল আকাবিরের এ বিষয়ে ইত্তেফাক রয়েছে।

৩. কখনো কোনো বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ প্রেক্ষাপটে যদি আকাবির উলামায়ে উম্মতের পক্ষ থেকে কোনো সম্মিলিত কাজে শরিক হওয়ার সাধারণ ঘোষণা আসে, তাহলে কেবল সেই ঘোষণার ভিত্তিতেই তালিবে ইলম ভাই তার মাদরাসা ছাড়তে পারেন না। কারণ এরূপ ঘোষণার অর্থ কখনো এটা নয় যে, যার যেভাবে ইচ্ছা কোনো উসূল ও আদব ছাড়াই বের হয়ে পড়বে; বরং এক্ষেত্রেও উসূলের পাবন্দীর শর্তটি অপরিহার্য ও স্বতঃসিদ্ধ। তাছাড়া আকাবির উলামায়ে কেরামের অবস্থান আমীরের পর্যায়ে নয়। যদি তা হতোও তাহলেও একটি স্বীকৃত মূলনীতি এই যে, 'আমীরে খাস'-এর হক 'আমীরে আম'-এর আগে। এক্ষেত্রে যেহেতু মাদরাসার মুহতামিম হলেন আমীরে খাস আর এখানে তিনি তার পরিমণ্ডলে প্রকৃত অর্থেই আমীর। তবে তার এই যিম্মাদারী মাদরাসার দস্তুর ও উসূল-যাওয়াবেত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

তাছাড়া তালিবে ইলম মাদরাসার সাথে এ অঙ্গীকার করে ভর্তি হয়েছে যে, সে মাদরাসার সকল উসূল ও নেযাম মেনে চলবে। তাই 'নির্দিষ্ট অথরিটি'র অনুমতি ছাড়া মাদরাসা থেকে বের হওয়া বা মাদরাসার নেযামের বাইরের কোনো কাজে অংশগ্রহণ করা তার জন্য জায়েয নয়। আর যারা মাদরাসার যিম্মাদার তারা তালিবানে ইলমকে কখন অনুমতি দেবেন, কীভাবে দেবেন তা চূড়ান্ত করবেন শরয়ী নীতিমালা ও মাদরাসার দস্তুরকে সামনে রেখে, পরস্পর মাশওয়ারা ও চিন্তা-ভাবনার পর। এতে যদি অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে পূর্ণ আনুগত্যের সঙ্গে তালিবে ইলম ভাইদের সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো 'বদগুমানি' বা 'বদযবানি' তাদের জন্য কোনোভাবেই জায়েয হবে না। এরপরও যদি তারা তা করে অথবা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া মাদরাসা থেকে বের হয় তাহলে সেটা হবে আবেগতাড়িত এমন অন্যায় কাজ, যা তাদের শিক্ষাজীবন বরকতহীন করে দেবে। এটা 'নুসরতে দ্বীন' হিসেবে গণ্য করার কোনো সুযোগ নেই।

তালিবে ইলমদের প্রতি কিছু মূল্যবান নসিহত: মুফতি তাকি উসমানী

যাহেরি তালিমের সঙ্গে বাতেনি তরবিয়ত জরুরি-

তালিমের সঙ্গে তালিবে ইলমদের দ্বীনি ও আখলাকি তরবিয়তও অত্যন্ত জরুরি। তাই ইলম হাসিলের পাশাপাশি আমল-আখলাকের সংশোধন করাও নিজেদের দায়িত্ব জ্ঞান করুন।

এ ব্যাপারে কোনো রকম অবহেলা করা যাবে না। কোথাও গাফলতি হলে আসাতিযায়ে কেরাম যে তাম্বীহ করবেন তা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

তাকবিরে উলার সঙ্গে বা-জামাত নামায আদায় করার ইহতিমাম করুন। তালিবে ইলমদের অভ্যস্ত হতে হবে, চলতে-ফিরতে কোনো না কোনো যিকির যেন তাদের মুখে থাকে। বিশেষত-

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

পাশাপাশি দরূদ শরীফ অধিক পরিমাণে পাঠ করবে।

সোহবতে আহলুল্লাহর ইহতিমাম

ইসলামি সমাজের একটি মৌলিক নীতি-

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

‘প্রকৃত মুসলিম সে, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।’

এটাকে স্বভাবজাত নীতিতে পরিণত করার জন্য তালিবে ইলমদের বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কিছুতেই বরদাশত করা হবে না।

তালিবে ইলমদের যেহেনে যেন আহলুল্লাহর সোহবতের গুরুত্ব বদ্ধমূল হয়। এ কথা তাদের ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে, আহলুল্লাহর সোহবত ব্যতীত মানুষ সাধারণত প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না।

আল্লাহমুখিতা! মাদরাসাসমূহের প্রাণ-

দ্বীনি মাদারিসের খেদমত করা একদিকে যেমন অনেক বড় নিয়ামত এবং সওয়াবের বিষয়, অপরদিকে তা বহুত বড় যিম্মাদারিও বটে। এ রাস্তায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যা হাসিমুখে মোকাবেলা করার জন্য আসবাবে যাহেরা (বাহ্যিক উপায়-উপকরণ) যতটা অবলম্বন করা জরুরি তার চেয়ে বেশি জরুরি ‘রুজূ ইলাল্লাহ’ তথা আল্লাহমুখী হওয়া। এটা মাদরাসাসমূহের প্রাণ।

আরবি কিতাবাদি ও শুরূহাত মুতালায় অভ্যস্ত হওয়া-

সরফ ও নাহুর তামরিন ও ইজরার আলোকে কিতাব হল্ করার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। উস্তাযের সামনে ইবারত পড়ে নিজের ভুলগুলো শোধরাতে হবে এবং সঠিক বিষয়টা কাওয়ায়েদের আলোকে বুঝতে হবে।

ছাত্রদের আরবি হাশিয়া বা আরবি শরাহ মুতালায় অভ্যস্ত হতে হবে। আজকাল উর্দু শরাহ ও তাকরিরগুলো ছাত্রদের মূল উৎস পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্যতাকে অনেক দুর্বল করে দিচ্ছে। এজন্য তাদের আরবি কিতাবাদি মুরাজাআত ও মুতালায় অভ্যস্ত হওয়া জরুরি।

তালিবে ইলমদের একাগ্রতা জরুরি-

তালিবে ইলমদের এই হাকিকতটাও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, ইলমে দ্বীন কোনো অংশীদার বরদাশত করে না (ইলম চায় না, ইলম তলবের সাথে সাথে তালিবুল ইলমের মাঝে অন্য কিছুরও তলব থাক)। ইলম হাসিলের জন্য নিজেকে পুরোপুরি ইলমের হাওয়ালা করে দিতে হবে।

.اَلعِلْمُ لَايُعْطِيْكَ بَعْضَه حَتَّى تُعْطِيَه كُلَّكَ

'ইলম তার অংশবিশেষও তোমাকে দেবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার সবটুকু ইলমকে দিয়ে দেবে।'

সেজন্য ছাত্ররা পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে মুতালাআ ও তাকরার করবে এবং সম্পূর্ণ মনোযোগসহকারে দরস শুনবে এবং বুঝবে। যতক্ষণ কোনো বিষয় বুঝে না আসবে ততক্ষণ যেন একজন তালিবে ইলমের মন স্থির না হয়। সেটা না বোঝা পর্যন্ত তার মন ব্যাকুল থাকবে। অপ্রয়োজনীয় দেখা-সাক্ষাৎ, গল্পগুজব এবং **মোবাইল** ব্যবহার তালিবে ইলমদের জন্য বিষ। এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে হবে।

ইত্তিবায়ে সুন্নত ও আখলাকি সিফাতের ইহতিমাম-

তালিবে ইলমদের ইত্তিবায়ে সুন্নতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। ইবাদাতের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, উত্তম আখলাক, ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকা, তাওয়াযু ও বিনয়, ধৈর্য ও সহনশীলতা, নির্মুখাপেক্ষিতা ও সংযম, সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতা- এগুলো অত্যন্ত উঁচু স্তরের সুন্নত। এগুলোর গুরুত্ব যেন তালিবে ইলমদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং এসব বিষয়ে যেন তারা কোনো ধরনের অবহেলা না করে।

শৃঙ্খলা ও পরিপাটি দ্বীন ও সুন্নতের অনেক বড় দাবি। তাই সর্বাবস্থায় ছাত্ররা নিজেদেরকে এক বিশৃঙ্খল দলে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখবে এবং নামাজের বাইরে অন্যান্য সময়েও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার অনুশীলন করবে।

সূত্র : মাসিক বেফাকুল মাদারিস (পাকিস্তান), জুমাদাল আখিরা ১৪৪৩ হি.

তালিবে ইলমের করণীয় ও বর্জণীয়

করনীয় বিষয় হলোঃ-

ক. নিয়্যাত বিশুদ্ধ করা ঃ ইলম তলবের জন্য নিয়্যাতকে বিশুদ্ধ করা জরুরী। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন, 'সকল কাজ নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল, ব্যক্তি তা পায় যা সে

নিয়্যাত করে। নিয়্যাতের মধ্যকার বিশুদ্ধতা তথা 'ইখলাস' হলো আল্লাহ এবং তার বান্দার মধ্যকার এমন এক নিবিড় সম্পর্ক যার নাগাল শয়তান এমনকি ফেরেশতাগন পর্যন্ত পায় না। কাজেই প্রত্যেক তালেবকে সর্বপ্রথম নিয়্যাত বিশুদ্ধ করতে হবে।

খ. আল্লাহর উপর ভরসা করা ঃ ইলম আল্লাহ পক্ষ থেকে প্রদত্ত মহা নেয়ামত। কাজেই তা অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা করা অতীব জরুরী। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহর তায়ালা ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।' (সুরা তালাক: আয়াত:০৩)।

গ. আশাবাদী হওয়া ঃ ইলম অর্জনের সময় বেশ আশাবাদী হওয়া। কেননা যারা নিরাশার দোলাচলে ঘুরপাক খায় তারা কিছুই অর্জন করতে পারেনা। আশাবাদ কোন কিছু অর্জনে ব্যক্তিকে চরম ভাবে উৎসাহিত করে। আল্লাহ পাক আশাবাদ অবলম্বন সম্পর্কে ইরশাদ করেন, 'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না'। (সুরা আয যুমার: আয়াত:৫৩)। কাজেই প্রত্যেক তালেবকে ইলম তলবের সময় আশাবাদী হতে হবে। কেননা ইলমও আল্লাহর রহমত।

ঘ. পবিত্রতা অবলম্বন কর ঃ ইলম মহাপবিত্র ও মহামূল্যবান সম্পদ। এ মহাপবিত্র সম্পদ তলব কালে প্রত্যেককেই পবিত্রতা আবলম্বন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ' পবিত্রতা ব্যতিত তোমরা তা স্পর্শ কর না'। (সুরা ওয়াকিয়াহ: আয়াত: ৭৯)। তিনি আরো ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তায়ালা পবিত্রতা অবলম্বন কারীদের ভালোবাসেন'। (সুরা বাকারাহ: আয়াত: ২২২)। কাজেই প্রত্যেক তালেবকে ইলম তলবের সময় পবিত্রতা অবলম্বন করতে হবে।

ঙ. তা'লীমের প্রতি সদা মনযোগী হওয়া ঃ ইলম যেহেতু মহা মুল্যবান সম্পদ কাজেই তা তলবের সময় তালেব কে তালীমের প্রতি মনযোগী হওয়া অতি জরুরী। কেননা মনযোগ ব্যতিত ইলম হাসিল হয়না।

চ. মুযাকারা, মুতালায়া, তাকরারে নিজেকে নিয়োজিত রাখা ঃ প্রত্যেক তালেব কে ইলম তলব কালীন সময়ে বর্তমান তালিম কে মুযাকারা, পুর্বের তালিম কে মুতালাআ, সামষ্টিক ও সম্মিলত ভাবে তাকরার চালিয়ে যাওয়া অতি জরুরী। কেননা এ সকল পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের ফলে ইলম অর্জনের পথ সুগম হয়।

ছ. নেক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা ঃ প্রত্যেক তালেব কে ইলম হাসিল কালিন সময়ে সকল নেক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

জ. আমল করা ঃ প্রত্যেক তালেব প্রতিদিন ইলম হিসেবে যা হাসিল করবে তার যথাযথ আমল করবে। কেননা আমল বিহীন ইলম মূল্যহীন । এক সময় দেখা যাবে যে, আমল না করার দরুন ইলম আর নেই।

তালেবে ইলমের বর্জনীয় বিষয়াবলী ঃ

১. মিথ্যা কথা বলা ঃ মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ। কাজেই ইলম হাসিল কারী তালেবে ইলমকে আবশ্যিকভাবে মিথ্যাকথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

২. কুচিন্তায় লিপ্ত হওয়া ঃ কুচিন্তা, কু মনন মানসিক কন্ডুয়ন সৃষ্টি করে যার প্রেক্ষিতে মানব দেহে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয় । কাজেই সুস্থ নিরোগ থাকার পাশাপাশি সরস মনের জন্য প্রত্যেক তালেবকে কুচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে সুচিন্তায় মনোযোগী হতে হবে।

৩. অসৎ সঙ্গ ঃ 'সৎ সঙ্গ স্বর্গ বাস অসৎ সঙ্গ সর্বনাস' এ প্রবাদের মর্ম চিরন্তণ। কাজেই সকল তালেবে ইলমকে ভালো মানুষদের সঙ্গী বানিয়ে নিজের যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ, মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং সকল প্রকার অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।

৪. প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয়ঃ প্রতারণা, শঠতা, ধোঁকা ইত্যাদী দুরারোগ্য আত্মিক ব্যাধি, যা মানুষের মনকে বিষিয়ে দেয়। মানুষকে অমানুষে পরিণত করে, মানুষকে নির্মম করে তোলে, যার ফলে দেখা যায় মানুষ মানুষের সাথে পশুসুলভ আচরণ করে। কাজেই তালেবে ইলমকে এ সকল ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে উত্তম চারিত্রিক গুণে গুনাণ্বিত হতে হবে।

৫. অলসতা অবলম্বণ ঃ অলস ব্যক্তি কখনো কামিয়াব হতে পারে না। অলসতা ব্যক্তিকে মনবিকলাঙ্গ করার পাশাপাশি অনেক সময় শারীরিক বিকলাঙ্গও করে ফেলে। কাজেই সকল তালেবকে অলসতা পরিহার করতে হবে।

৬. হিংসা বিদ্বেষ পরনিন্দা পরচর্চা করা ঃ এ সকল ব্যাধি শুধু মাত্র ব্যক্তিকেই ধ্বংস করে না বরং গোটা সমাজকেই ধংস করে। কাজেই এ সকল ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে নিজেকে মুক্ত রাাখতে হবে। এ সকল ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি যেমনিভাােব উদার হতে পারে না ঠিক তেমনি ভাবে মানুষের হিতাকাঙ্খিও হতে পারে না।

৭। লক্ষ্যবিহীন অধ্যয়ন ঃ লক্ষ্যহীন ব্যক্তি কখনোই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনা। কাজেই তালেবে এলেমকে অধ্যয়ন কালে তার সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে সে পথে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই উক্ত তালেব তার কাঙ্খিত মঞ্জিলে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

৮। অযথা সময় অপচয় ঃ মানব জীবনে সময়ের গুরুত্ব অত্যধিক। যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নেয়ার ফলে অনেক সময় দেখা যায় মানুষ প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। তালেবে ইলমের নিকট সময় অনেক দামী নেয়ামত। কাজেই কোন অবস্থায় সময় অপচয় করা যাবে না।

শেষ কথা ঃ মহান আল্লাহর বানীকে তাঁর জমিনে রাসুল (সা.) এর সুন্নাহর আলোকে বাস্তবায়নে তালেবে ইলমের ভূমিকা সর্বাগ্রে। কাজেই প্রত্যেক তালেবকে হতে হবে আল্লাহ প্রিয় বান্দা ও রাসুল (সা.) এর সুন্নাহর খাঁটি অনুসারি। প্রকৃত তালেবে ইলমকে করণীয় বিষয়াবলীকে একনিষ্ঠভাবে পালন করতে হবে এবং বর্জনীয় বিষয়াবলী জীবন থেকে সতর্কতার সাথে পরিহার করতে হবে।

লেখকঃ মুহাদ্দিস, নোয়াখালী কারামাতিয়া কামিল মাদরাসা, সোনাপুর, সদর, নোয়াখালী।

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে বয়সের বাঁধা পেরিয়ে কীর্তিমান মনীষীগণ

ইলম অর্জনের অভাবিতপূর্ব মর্যাদা ও গুরুত্ব

কুরআন-হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থে দীনি ইলম অর্জনের অভাবিতপূর্ব মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা ওঠে এসেছে। দীনি ইলমকে আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকার আখ্যা দিয়ে এর মাহাত্মে অনন্য মাত্রা যুক্ত করা হয়েছে। অর্জনকারী ব্যক্তিকে জান্নাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্বনবী ﷺ। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। (সূরা মুজাদালাহ ১১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَن سلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيهِ علمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّةِ

যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (সহীহ মুসলিম ২৬৯৯)

দীনি ইলম অর্জনের অসাধারণ ৫ উপকারিতা

তাফসীরে দীনি ইলম অর্জনের অসাধারণ ৫ উপকারিতার কথাও ওঠে এসেছে। দীনি জ্ঞান না থাকলে আল্লাহকে ভয় করার গুণ থেকেও বঞ্চিত হয় মানুষ। আল্লাহর ভয়ই মানুষকে অসৎ কাজ থেকে দূরে রেখে নেক কাজের দিকে ধাবিত করে। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, কুরআন তাদের জন্যই পথপ্রদর্শক। জগদ্বিখ্যাত তাফসীর বিশারদ ইমাম রাযী রহ. দীনি ইলমকে বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করে এর ৫টি অসাধারণ মর্যাদা তুলে ধরেছেন। তাহলো–

১. বৃষ্টি যেমন আসমান থেকে নাজিল হয় তেমনি দীনি ইলমও আসমান থেকে নাজিল হয়।

২. দীনি ইলম বৃষ্টির ন্যায়। বৃষ্টির কারণে জমিন যেভাবে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হয়। তেমনি দীনি ইলম অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণগুলো অর্জিত হয়।

৩. বৃষ্টি ব্যতিত যেমন জমিন থেকে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় না, ঠিক দীনি জ্ঞান ব্যতিত মানুষও আল্লাহ তাআলার ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত হতে সক্ষম হয় না।

৪. বজ্রধ্বনি বা বিদ্যুৎ চমকানোর ফলে যেমন বৃষ্টি হয়; তেমনি দীনি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ জান্নাতের প্রত্যাশী হয় এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পায়।

৫. বৃষ্টি যেমন অনেক সময় উপকারী হয় আবার অপকারী হয়, ঠিক দীনি জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার মধ্যে যেমন উপকার হয় তেমনি আমল না করলে তা অপকারীও হয়। (তাফসীরে কাবীর ২/১৯৮)

ইলম অর্জনের সুনির্দিষ্ট কোন বয়স নেই

এ ইলম অর্জনের সুনির্দিষ্ট কোন সময় নেই। যখনই জাগ্রত হবে তখনই পদক্ষেপ নিবে। মুমিনের ইলম অর্জনের সময়কাল তার দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যেভাবে শৈশবেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আরম্ভ হয়, সেভাবে জীবনের একটা বড় সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ইলম তলবের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়াটাও ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বসূরী আকাবিরদের অনেকেই শৈশব- কৈশোরের ধাপ পেরিয়ে ইলমের ময়দানে আত্মনিয়োগ করেও ইলমের অতল গভীরে পদচারণা করেছেন। শুধু তাই নয়, ইলমের যথাযথ হক আদায়ের জন্য যে বোধশক্তি ও বিবেক থাকা দরকার তা অনেক ক্ষেত্রে ইলম তলবকারীর প্রাপ্তবয়স দাবি করে। এ কারণে আল্লামা সুয়ুতী বলেন, কোন কোন আলেমের মতে হাদীসে নববী শ্রবণের সূচনা হওয়া উচিত ত্রিশ বছর থেকে। (তাদরীবুর রাবী ১/৪১৪)

পরিণত বয়সে ইলম অর্জন

ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সকলেই ছোট ছিলেন না; বরং তাদের অসংখ্যই ছিলেন বয়সে বড়। বয়স তাদের ইলম অন্বেষণ ও শিক্ষাগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। অথচ তাঁরাই ছিলেন দীনি ইলম ও শরঈ আহকামের নির্ভরযোগ্য উস্তাদ; কুরআন ও হাদীস অনুধাবনের মূল উৎসও। হযরত সিদ্দীকে আকবর ছিলেন রাসূলে আরাবীর পর উম্মতের সবচেয়ে বড় আলেম। ইলমের ময়দানে তাঁর বিচরণ শুরু হয় প্রায় ৪০ বছর বয়সে। হযরত উমর ফারুক রাযি. ও ৩০ বছর বয়সে ইলমের ময়দানে পা রাখেন। এছাড়া আবু যর রাযি., আবুদ দারদা রাযি., প্রমুখ উম্মতের সবচে জ্ঞানী এ মহামানবগণ ইলম শিখেছেন বয়স অনেক হয়ে যাবার পর। আরো অনেকেই যুবা কিংবা পৌঢ় বয়সে ইলমে অর্জনে ব্যাপৃত হন। পরিণত বয়সে দীনি ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম হতে পারেন আমাদের প্রেরণার উৎস।

ইমাম বুখারী রহ. ইলম অধ্যায়ে হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করে পরিচ্ছেদ গঠন করেছেন এভাবে–

باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر : تفقهوا قبل أن تُسوَّدوا

পরিচ্ছেদঃ ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়ার আগ্রহ প্রসঙ্গে। আর উমর রাযি. বলেন, তোমরা বয়স অধিক হওয়ার আগেই ইলম শিখে নাও।

সহীহ বুখারীতে উমর রাযি.-এর উল্লেখিত বক্তব্য উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রহ. নিজেই এর ব্যাখ্যায় বলেন,

وبعد أن تسوَّدوا ، وقد تعلم أصحاب النبي ﷺ في كبر سنِّهم

অর্থ্যাৎ বয়স বেশি হওয়ার পরও ইলম শিক্ষা কর। কারণ সাহাবায়ে কেরাম (অধিকাংশ) তো বয়স অধিক হওয়ার পরই দীনী ইলম শিক্ষা করেছেন। (সহীহ বুখারী পৃ. ৩৯)

বয়সের বাঁধা পেরিয়ে কীর্তিমান মনীষীগণ

যার কারণে পূর্বসূরি বরণীয় উলামায়ে হক্কানীর মধ্যে এমন ব্যক্তিত্বের সংখ্যাও কম নয় যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইলমের নূর ধারনে উদ্যোগী হয়েছেন। যেমন,

১. আলী ইবনে হামযা। ইমাম কিসাঈ নামেই যিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইলমে নাহুর প্রতিটি ছাত্র এই নামের মহান মানুষটির সাথে পরিচিত। আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রে যার রয়েছে বিশাল অবদান। ইমাম শাফিঈ যার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,

من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي

ইলমে নাহুর ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চাইলে কিসাঈ-র পোষ্যবর্গ হতে হবে। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ০৭/৫৪)

ইলমে কিরাআতেরও অন্যতম ইমাম তিনি। যে সাত কেরাতের কথা আমরা সবাই জানি, সে সাত কেরাতের এক কেরাত তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত। তিনি বয়স অনেক হওয়ার পরই ইলমে নাহু শেখা শুরু করেছেন। আল্লামা কিফতী রহ. বলেন,

انما تعلم الكسائي النحو بعد الكبر فلم يمنعه ذلك من ان برع فيه

কিসাঈ বয়স অনেক হওয়ার পরই নাহু শেখা শুরু করেন। এ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনে অধিক বয়স তার জন্য বাধা হয় নি। (আমবাউর রুয়াত ২ / ২৭১)

২. আল্লামা ইবনে হাযম রহ.। ইসলামের ইতিহাসে যারা অমর হয়ে আছেন তিনি তাদের অন্যতম। আল্লামা যাহাবী রহ. তার ব্যাপারে বলেন,

ومن أشهر من ذكر عنهم الطلب بعد كبر السن ابن حزم الأندلسي

বয়স হওয়ার পর যারা ইলম শেখা শুরু করেছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইবনে হাযম আন্দালুসী।

তার ইলমে ফিকহ অন্বেষণের সূচনা হয়েছিল বিশেষ একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে। ইবনে হাযম রহ. নিজেই সে ঘটনা বলেছেন। একদিন তিনি এক জানাযায় শরিক হন। তখন এক মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়েন। এক ব্যক্তি তখন তাকে বলল, ওঠ, আগে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়। তখন তার বয়স ছিল ছাব্বিশ। তিনি তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যান। জানাযা শেষে ফিরে আসার সময়ও মসজিদে যান। এবার প্রবেশ করা মাত্রই নামায শুরু করে দেন। তখন তাকে বলা হল, আরে বস বস; এখন নফল নামায পড়ার সময় নয়। তখন ছিল আসরের পর। এ ঘটনাটি তার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। এরপর থেকেই তিনি ইলম অর্জন শুরু করেন। তার এ অজ্ঞতাই ইলম অর্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। (মু'জামুল উদাবা, ইবনে হাযম রহ.-এর জীবনী)

৩. আবু বকর আল-কফ্ফাল রহ.। শাফেঈ মাযহাবের অন্যতম ইমাম তিনি। আল্লামা সুবুকী রহ. বলেন,

فلما كان ابن ثلاثين سنة أحس من نفسه ذكاء :فأقبل على الفقه

শায়েখ ইমাম আবু বকর আল-কফ্ফাল রহ. বয়সের কোঠা ত্রিশ পেরিয়ে যাওয়ার পর ইলম অন্বষণের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এক পর্যায়ে ফিকাহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। (তাবাকাতুশ-শাফিইয়্যা ৫/৫৪)

৪. আবু আবদুল্লাহ আসবাগ ইবনুল ফারজ রহ.। মালেকী মাযহাবের বরেণ্য ফকিহ। আল্লামা যাহাবী রহ. তার ব্যাপারে বলেন,

وطلب العلم وهو شاب كبير

তিনি পৌঢ় বয়সে ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৬৫৬)

৫. ঈসা ইবনু মুসা গুঞ্জার রহ.। উপনাম ছিল আবু আহমাদ আলবুখারী। মা-ওয়ারাউননাহর তথা ট্রান্স অক্সিয়ানা অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। হাকিম রহ. বলেন,

هو إمام عصره ، طلب العلم على كبر السنِّ ، وطوَّف

তিনি ছিলেন নিজ যুগের ইমাম। পরিণত বয়সে ইলম শিখেছেন। ইলম অন্বেষণে অনেক পরিভ্রমণ করেছেন। (শাযারাতুয যাহাব ১/৩৩০)

৬. হারিস ইবনু মিসকিন রহ.। মিসরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ২৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছিলেন। আল্লামা যাহাবী রহ. তার ব্যাপারে বলেন,

وإنما طلب العلم على كبَر

তিনি পৌঢ় বয়সে ইলম শিখেছেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৫৪)

৭. ইজ্জুদ্দীন ইবনুস সালাম রহ.। ইলমী আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। সত্য কথন ও সাহসী উচ্চারণে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ যাকে সুলতানুল উলামা (উলামা-সম্রাট) উপাধি দিয়েছেন। বাস্তবিক অর্থেই তিনি ছিলেন সম্রাটতুল্য একজন মানুষ। মানুষের হৃদয়জগতে তিনি ছিলেন সম্রাটের চেয়েও সম্মানিত। পরাক্রমশালী শাসকেরা পর্যন্ত মাথা নত করত তার সামনে। ইজ্জুদ্দীন রহ.-এর জানাযার খাট নিয়ে মানুষ যখন শাহী প্রাসাদের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল তৎকালীন শাসক আলমালিকুয যাহির তখন বলেছিল,

আজ আমার রাজত্ব স্থিতিশীলতা লাভ করেছে। এই শায়েখ যদি জনগণকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলতেন তাহলে তিনি আমার থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে পারতেন। – তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৫

এই উলামা-সম্রাটও ইলম শেখা শুরু করেছেন বয়স অনেক হওয়ার পরে। তার জীবনীতে লেখা হয়েছে–

كان الشيخ عز الدين في أول أمره فقيرا جدا ولم يشتغل إلا على كبر

ইজ্জুদ্দীন রহ. প্রাথমিক অবস্থায় খুবই গরীব ছিলেন। তিনি ইলম অর্জনে মাশগুল হয়েছেন অনেক বয়সে। (তাবাকাতুশ-শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৫)

এছাড়াও ফুযাইল ইবনে ইয়ায, ইবনুল আরাবী রহ. প্রমুখের মতো উজ্জ্বল নক্ষত্ররা বয়সের বাধা পেরিয়ে ইলমী অঙ্গনকে শাসন করেছেন।

ইবনু উকাইল রহ. বলেন, আশি বছরের বার্ধক্যে আমি ইলমে যে স্বাদ পেয়েছি তা চল্লিশ বছরে ইলমের স্বাদ অপেক্ষা তীব্র ছিল।

একটি প্রেরণা-জাগানিয়া ঘটনা

বয়সকালে ইলম শেখার ক্ষেত্রে একটি সমস্যার কথা অনেকেই সামনে নিয়ে আসেন। তা হল, বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে কিছু আর মনে থাকতে চায় না। কোনো কিছু মুখস্থ করতে হলে অনেক সময় লাগে। কারো কারো ক্ষেত্রে এ সমস্যার বাস্তবতাও পাওয়া যায়। তবে এ বাস্তবতা মেনে নিয়েই বলছি, মানুষ যখন কোনো কাজের হিম্মত করে তার জন্য শতভাগ চেষ্টা ব্যয় করে তখন সে কাজটি আল্লাহ তাআলা তার জন্য সহজ করে দেন। একটা উদাহারণ দেই।

শাফেঈ মাযহাবের অন্যতম ইমাম আবু বকর আল-কফ্ফাল রহ.। ইতিপূর্বে বলেছিলাম, বয়সের কোঠা ত্রিশ পেরিয়ে যাওয়ার পর ইলম অন্বষণে ব্রতী হন। আল্লামা সুবুকী রহ. তাঁর ব্যাপারে বলেন,

الإمام الجليل أبو بكر القفال الصغير ، شيخ طريقة خراسان

মহান ইমাম আবু বকর আল-কফ্ফাল। খুরাসানের তরিকতের ইমাম...। (তাবাকাতুশ-শাফিইয়্যা ৫/৫৪)

এ মহান মনীষীর জীবনেও উপরেল্লেখিত সমস্যাটি এসেছিল। তবুও সে প্রতিবন্ধকতা দূর করে তিনি কীর্তিমানদের মাঝে অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিলেন।

ইলম শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথমে তুর্কিমিনিস্তানের 'র্মাও' এলাকার একজন শায়েখের কাছে যান। তিনি তাকে কিতাবুল মুযানীর এ তিনটি শব্দ প্রথম দিন শেখান,

هذا كتاب اختصرته

এ পাঠ গ্রহণ করে তিনি ছাদে চলে যান। এশা থেকে ফজর পর্যন্ত এ তিনটি শব্দই মুখস্থ করতে থাকেন। সারা রাত জেগে থাকার কারণে শেষ রাতে একটু চোখ লেগে আসে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সারা রাত ধরে কী পড়েছেন কিছুই মনে পড়ছে না। তিনি এ কথা ভেবে লজ্জিত হচ্ছিলেন যে, শায়েখকে আমি কী বলব। এ দুশ্চিন্তার মাঝেই হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এমন সময় প্রতিবেশী এক মহিলা বলল,

يا أبا بكر لقد أسهرتنا البارحة في قولك هذا كتاب اختصرته

আবু বকর! গতকাল রাতে **هذا كتاب اختصرته** বলে বলে তো সারা রাত আমাদের ঘুমাতে দাও নি।

মহিলার অভিযোগভরা কথার মাঝেই তিনি যেন খুঁজে পেলেন হারানো সম্পদ। শায়েখের কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। শায়েখ তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

لا يصدَّنَّك هذا عن الاشتغال، فإنك إذا لازمت الحفظ والاشتغال صار لك عادة

এ কারণে যেন তোমার ইলম শেখার আগ্রহে ভাটা না পড়ে। কারণ তুমি যখন ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকবে এবং সবসময় মুখস্থ করতে থাকবে তখন তা তোমার অভ্যাসে পরিণত হবে। (মু'জামুল বুলদান ৫/১১৬)

শায়েখের কথা সত্যি হয়েছিল। কঠিন অধ্যাবসায় ও চেষ্টা-মুজাহাদার মাধ্যমে এমন দুর্বল মুখস্থশক্তির অধিকারী মানুষটিই হয়েছিলেন নিজ যুগের বরেণ্য ইমাম। ৪১৭ হিজরিতে তিনি ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন। এ কারণে তাঁর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে,

عاش ثمانين سنة، أربعين جاهلا، وأربعين عالما

অর্থাৎ, আশি বছর বেঁচেছিলেন। ৪০ বছর জাহিল বা মূর্খ হয়ে। আর ৪০ বছর আলেম হয়ে। (মু'জামুল বুলদান ৫/১১৬)

আসলে যদি দিলে সাচ্চা ইরাদা ও পোখতা হিম্মত থাকে তাহলে সব কঠিনকেই আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন। আর যদি শত চেষ্টার পরও মুখস্থ না হয় বা না বুঝে আসে তবুও এ চেষ্টার কারণে আল্লাহ তাআলা আজর ও সাওয়াব আমাদের দান করবেন।

যারা বয়স হওয়ার পর ইলমী নববীর নূর ধারনে উদ্যোগী হয়েছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের মেহনতের জযবা বাড়িয়ে দিন এবং যত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সবগুলো নিজ অনুগ্রহ ও আপন কুদরতে দূর করে দিন। আমীন।।

উস্তাদের দুআ ও একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

মুহাম্মাদ ত্বহা হুসাইন

জীবনে উন্নতি-অবনতির ক্ষেত্রে মা-বাবা ও উস্তাদের দুআ ও বদ দুআর বিরাট প্রভাব রয়েছে। বিশেষত আমরা যারা তালিবুল ইলম, তাদের দুনিয়া-আখেরাতের কামিয়াবির জন্য উস্তাদের দুআ ও তাওয়াজজুহর বিকল্প নেই। এটি আমাদের জীবন-পথের পাথেয়। উস্তাদের দুআ-তাওয়াজ্জুহ যেমন একজন তালিবে ইলমকে উন্নতির পরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে, তেমনি তাঁদের অন্তরের চোট ও ব্যথাও চরম হতে পারে ক্ষতির কারণ। শুধু ইলমী যিন্দেগীতেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই উন্নতি ও অবনতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এ কথা সত্য যে, মানুষের কৃতকর্মের ফলেই তার উপর বালা-মুসিবত আসে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বান্দা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না, কোন গুনাহর কারণে কোন মুসিবতটি এসেছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে, সম্ভবত অমুক গুনাহর কারণেই এই মুসিবতটি এসেছে। কোনো ভুল আকীদা পোষণ না করলে নিজের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য এটুকু অনুমান করতে অসুবিধা নেই। সংশোধন ও শিক্ষাগ্রহণের জন্যই কয়েক যুগ আগের একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা এখানে তুলে ধরছি।

তখন আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রাহ. ভারতের নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্মৌর নাযিমে আলা। নদওয়াতুল উলামার এই দায়িত্ব পালনকালে তিনি কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাঁর এসব পদক্ষেপ ও তার প্রতিক্রিয়ার কথা আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. লেখেন, 'দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার রূহানি ও ফিকরি

তারাক্কীর জন্য সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রাহ.-এর নতুন চিন্তা-ভাবনা ও পদক্ষেপগুলোর পক্ষে ছাত্রদের পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। বরং ভেতরে ভেতরে এক ধরনের অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল নদওয়ার ১৯৪৩ সালের অনাকাঙ্খিত ছাত্র-ধর্মঘটের মাধ্যমে। যদিও ধর্মঘটের সূচনা হয়েছিল ব্যবস্থাপনাগত কিছু বিষয় থেকে, কিন্তু এর পেছনে মূল কারণ ছিল সাইয়্যেদ সাহেবের গৃহীত সংস্কার উদ্যোগ।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ধর্মঘটের নেতৃত্বে ছিল আমাদেরই স্নেহভাজন কিছু শাগরিদ, যারা ছিল দারুল উলূমের প্রথম সারির ছাত্র। যাদের নিয়ে আমাদের, বরং পুরো দারুল উলূমের অনেক স্বপ্ন ছিল। অনেক আশা ও প্রত্যাশা ছিল।

আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল আমার অতি প্রিয় ও স্নেহভাজন একজন ছাত্র। আমি দারুল উলূমে দশ বছর শিক্ষক ছিলাম। এরপর নায়েবে নাযিম ও নাযিম হিসেবেও বহুদিন কাজ করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে এই নওজোয়ানের চেয়ে মেধাবী, প্রতিভাবান ও রুচিশীল কোনো তালিবে ইলম আমি দেখিনি।

দ্বিতীয়-তৃতীয় স্তরে পড়ার সময় তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, সাবলিল আরবীতে সে লিখতে ও বলতে পারত। তাতে নাহু-সরফের কোনো ত্রুটি হওয়াও মুশকিল ছিল। যখন সে তৃতীয়-চতুর্থ স্তরের ছাত্র তখন একবার তার পরীক্ষার খাতা দেখে আমার প্রিয় উস্তাদ আরবী সাহিত্যের পন্ডিত মাওলানা খলীল আরব বলেছিলেন, 'খাতাগুলি দিন, এগুলো দেখিয়ে যত বেশি বলুন, নদওয়ার জন্য আমি চাঁদা তুলতে সক্ষম। যখন সে চতুর্থ-পঞ্চম স্তরে পড়ে তখন তাৎক্ষণিকভাবে যে কোনো বিষয়ের উপর আরবী ভাষায় সাবলিলভাবে বক্তব্য দিতে পারত। স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, ঐ বয়সেই ইকবাল, আকবর ইলাহাবাদী ও যফর আলী খানের মতো কবিদের হাজারো শের তার ঠোঁটস্থ ছিল।

এই হাঙ্গামার পর যখন সে করাচি গেল, এত কম বয়সী হওয়া সত্ত্বেও করাচির ইলমী ও গবেষণা মজলিসগুলোতে আল্লামা খেতাবে বরিত হতে লাগল।

আন্দোলন-হাঙ্গামাগুলো যেমন ঘটে থাকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে এই অনাকাঙ্খিত ঘটনার নেতায় পরিণত হল। এই হাঙ্গামায় তার অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানে তার সকল উস্তাদ, বিশেষত আমি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম। কারণ আমি জানতাম, এই হাঙ্গামার সবচেয়ে বড় আঘাত আসবে সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রাহ.-এর ব্যক্তিত্ব ও তার পরিচালনার উপর। কারণ তিনি তখন নদওয়ার প্রধান মুরববী ও একমাত্র অভিভাবক। নদওয়ার জন্য তিনি ছিলেন জান কুরবান।

এই হাঙ্গামার কারণে সাইয়্যেদ সাহেবের দিলে খুব চোট লেগেছিল। তাঁর মনে নদওয়ার খেদমত ও ছাত্রদের তারবিয়তের বড় বড় স্বপ্ন ছিল, যা তিনি এই হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে ধুলোয় মিশে যেতে দেখলেন। তার সকল সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার দৃশ্যও দেখতে পেলেন। তিনি বেচাইন হয়ে গেলেন এবং তাঁর দিল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

এই সময়েরই ঘটনা। আমাদের সেই প্রিয় ছাত্রটি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেল। হালত এতই নাজুক হল, আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখতে বাধ্য হল। বহু

চিকিৎসা করানো হল। একপর্যায়ে তার এক ভাই আমাদের বাড়িতে এসে আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ডাক্তার সাইয়েদ আবদুল আলী সাহেবকে তার চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেল। বিশেষ সম্পর্কের সুবাদে আমিও তার সাথে গেলাম। বিশ্বাস করুন, 'রশিতে বাঁধা আমার প্রিয় ছাত্রকে দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি।

আফসোস! মেধা ও প্রতিভায় যে ছিল সবার ঈর্ষার পাত্র, আজ তার এই করুণ অবস্থা!!

আমার ভাই ঔষধ-পত্র লিখে তাশরীফ নিয়ে এলেন।

সে সময় সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রাহ. এতই ব্যথিত ছিলেন যে, রাতে দারুল উলূমে থাকতেন না। থাকতেন আমাদের ঘরে। একদিন একাকীত্বের সুযোগে আমি তাঁর কাছে আরয করি, 'আমার ধারণা, অমুক ছাত্রটির মুখ থেকে আপনার ব্যাপারে কোনো শব্দ বের হয়ে গিয়েছিল। হাঙ্গামার তুফানে এটা অসম্ভব নয় যে, আবেগতাড়িত হয়ে কোনো অসৌজন্যমূলক আচরণ সে করে ফেলেছে। আর হাদীস শরীফে তো আল্লাহ বলেছেনই-

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب

যে আমার কোনো ওলি-বুযুর্গকে কষ্ট দিবে, তার সাথে স্বয়ং আমি আল্লাহ যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আর আপনি তো তার অত্যন্ত মুহসিন অভিভাবক ও শফীক মুরব্বী!!

উত্তরে সাইয়েদ সাহেব তাওয়াযূ ও বিনয়ের সাথে বললেন, আমিই বা আর তেমন কে?

আমি পুনরায় একই কথা আরয করলাম এবং সেই ছাত্রটির জন্য দুআর দরখাস্ত করলাম। কিন্তু সাইয়েদ সাহেব চুপ রইলেন। কিছুই বললেন না।

দুই কি তিন দিন পর। তিনি আমাকে বললেন, 'মৌলভী আলী! আমি আপনার হুকুম পালন করতে পেরেছি।'

এখন আপনি একে সাইয়েদ সাহেবের কারামত বলুন বা অন্য কিছু, এর পরপরই আমাদের এই প্রিয় ছাত্রটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। আমি যতটুকু জানি, দ্বিতীয়বার সে এই রোগে আক্রান্ত হয়নি।

কিন্তু খুব কম বয়সেই ১৯৫০ সালে ক্ষণিকের জ্বলে উঠা এই প্রদীপ শিখা চিরদিনের জন্য নিভে গেল।

حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے

আফসোস! ঐ কলির তরে, না ফোটেই যা গেল ঝরে। (দেখুন পুরানে চেরাগ ১/৪০-৪২)

প্রিয় তালিবে ইলম ভাই! এই মর্মস্পর্শী ঘটনাটি বারবার পড়ুন এবং হৃদয়ে খোদাই করে রাখুন। উস্তাদদের ছায়ায় থেকে তাঁদের খেদমতে সঁপে দিতে না পারি, যদিও এটিই ছিল একজন হাকীকী তালিবে ইলমের প্রধান কাজ, অন্তত এতটুকু সতর্ক তো অবশ্যই থাকতে পারি যে, আমার কাজ-কর্মে এবং আচরণ-উচ্চারণে আমার উস্তাদকে 'উফ' বলতে না হয়।

শিক্ষকদের প্রতি সম্মান ও তাদের খেদমত।

بسم الله الرحمن الرحيم- الحمد لله رب العالمين- و الصلاة و السلام على معلم الإنس و الجان، سيدنا محمد العربى- على آلہ و أصحابه أجمعين- أما بعد: হে প্রিয় বৎস! যে তোমাকে ইলমে দীনের একটি হরফ শিক্ষা দিয়েছে, সে তোমার পিতা সমতুল্য। তার অধিকার রক্ষা করা তোমার উপর ওয়াজীব, যেমন রক্ষা করা ওয়াজীব পিতা-মাতার অধিকার। যেনে রেখো! শিক্ষক যদি মুত্তাকী-পরহেজগার হয়, তাহলে তার অধিকার পিতা-মাতার চেয়েও বেশী। কথাটি বুঝিয়ে বলছি, শুনে রেখো, হে বৎস! পিতা-মাতা সন্তানের হাত ধরে দুনিয়ার আগুণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দীনি শিক্ষক তোমাকে দীন শিখিয়ে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। এবার তুমি ভেবে দেখো, কার উপকার বেশী শক্তিশালী? তবে আমি পিতা-মাতার সম্মানকে খাটো করে দেখছি না। হে প্রিয় বৎস! বলোতো, সাহাবা আজমাঈনদের শিক্ষক কে ছিলেন? অবশ্যই বলবে, সে তো মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দ)। তারা তাকে কিরকম সম্মান করতেন? অবশ্যই বলবে, সব চেয়ে বেশী। এমনকি পিতা-মাতার চেয়েও। যদি তোমাকে প্রশ্ন করি, অরাসাতুল আম্বিয়া কারা? তাহলে বলবে, হক্কানী আলেমগণ। আমি বলব, হক্কানী আলেমই তো তেমার দীনি শিক্ষক। যারা নবিদের স্থলাভিষিক্ত, তারা কি সম্মান পওয়ার বেশী উপযুক্ত নয়? নির্দিদ্বায় তুমি বলবে, তারাই সম্মান পওয়ার বেশী উপযুক্ত। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জটিল সমস্যা হলো, ছাত্ররা পিতা-মাতার আনুগত্য ও সম্মান যতটুকু করে, শিক্ষকদের সম্মান তার তুলনায় মোটেই করতে রাজী নয়। এর গুরুত্ব ততটা উপলব্ধিও করে না। পিতা-মাতা, আতœীয়-স্বজনকেই প্রকৃত অভিভাবক মনে করে। অথচ ইলমে দীনের ক্ষেত্রে প্রকৃত মুরব্বি হলেন একমাত্র দীনি ওস্তাদ। নিয়ম হলো, ইলমে দীন অর্জনের জন্য পিতা-মাতা, আতœীয়-স্বজন খরচ বহনের অভিভাবকত্ব করবে আর মুত্তাকী শিক্ষককে অভিভাবক ও পরামর্শদাতা বানিয়ে নিজের জীবন গড়বে। যে-ই এটা বুঝতে ভুল করবে, সে-ই অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। * ইসলামের চত’র্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) শিক্ষকের মর্যদা দিতে গিয়ে বলেন, أنا عَبْدٌ مَنْ عَلَّمَنِى حَرْفًا وَاحِدا، إنْ شَاءَ بَاعَ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ إِسْتَرَقَّ- অর্থাৎ- আমি তার গোলাম, যিনি আমাকে একটি হরফ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি চাইলে আমাকে বিক্রি করতে পারেন, অথবা মুক্ত করতে পারেন। আবার চাইলে দাসও বানিয়ে রাখতে পারেন। * تَعْلِيْمُ المُتعَلِّم কিতাবে লেখা আছে- শিক্ষকের সম্মানার্থে তাকে এক হরফ শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক হাজার দেরহাম দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকের সম্মান করলে নিজের জীবন ধন্য হয়, তার অসম্মান করলে নিজের জীবন ধ্বংস হয়। * তালিমুল মুতায়াল্লিম কিতাবে আছে- إِنَّ الْعِلْمَ لَا يُفِيْدُ صَاحِبَهُ إِنْ لَمْ يَحْتَرِمْ أَسَاتِذَتَهُ وَ مُعَلِّمِيْهِ অর্থাৎ- যতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্র শিক্ষকের সম্মান করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইলম দ্বারা ফায়েদা লাভ করতে পারবে না। * বলা হয়ে থাকে, مَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَّا بِالْحُرْمَةِ - وَ مَا سَقَطَ مَنْ سَقَطَ إِلَّا بِتَرْكِ الْحُرْمَةِ - অর্থাৎ- যে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছেছে, সে সম্মান রক্ষার কারণেই পৌছেছে। আর যে ব্যর্থ হয়েছে, সে সম্মান রক্ষা না

করার কারণেই হয়েছে। * আল্লামা শায়েখ ইলিয়াস (রহ) ইন্তেকালের পূর্বে ছাত্রদের উপদেশ স্বরুপ বলেছিলেন, “তোমরা শিক্ষকদের সম্মান করবে এবং তাদের সাথে আদব রক্ষা করে চলবে। শিক্ষকই হলেন ইলমে দীন হাসিলের সবচেয়ে বড় অসিলা। যিনি দীন সম্পর্কিত একটি শব্দ বা বাক্য কাউকে শিক্ষা দিবেন, তিনি তার মনিবতুল্য”। * ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) বলেন, مَنْ غفَلَ عَنْ حَقِّ الأُسْتَاذِ لَا يُفْلِحُ أَبَدًا- অর্থাৎ- যে ছাত্র শিক্ষকের হক আদায়ে অমনযোগী, সে কখনোই সফলকাম হবে না। * خُلَاصَةُ الْفَتْوىٰ কিতাবে আছে, “ছাত্রদের উচিত, শিক্ষকদের আগে আগে কথা না বলা। শিক্ষকদের বসার স্থানে না বসা। এমনকি তাদের অনুপস্থিতেও নয়”। আলেমদের সাথে বেয়াদবী করলে তার পরিণতি কি হয়, তার দৃষ্টান্ত স্বরুপ

* আল্লামা মুনাজির আহসান জিলানী বলেন, “ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিশিষ্ট তাবেয়ী সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহ) কে নির্মমভাবে হত্যা করার পর স্বপ্নে দেখেন, সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহ) তার জামা টেনে ধরে বলতেছেন, হে আল্লাহর দুশমন! কি কারণে আমাকে হত্যা করলে? তৎক্ষণাৎ আতঙ্কিত অবস্থায় জাগ্রত হয়ে বললেন, আমার সাথে সাঈদের কি হলো? তাকে হত্যা করার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শরীরে ঠান্ডাজনিত প্রচন্ড কাপুনি রোগ দেখা দিল। অন্তর থেকে সমস্ত শরীর বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গেল। ফলে তার আদেশে লোকেরা জ¦লন্ত কয়লা দিয়ে সমস্ত শরীরে তাপ দিতে লাগল। কিন্তু তাতে তার রোগ আরো বাড়তেই লাগলো। অতপর ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার শরীরের গোশতের প্রতিটি কোষে কোষে কীট আক্রমণ করে ফেলেছে এবং এর কোনো চিকিৎসাও নেই। নিরাশ হয়ে যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম হাসান বছরী (রহ) কে ডাকলেন, এবং নিজের জন্য দোয়ার আবেদন করলেন। হাসান বছরী (রহ) তার অবস্থা দেখে কেঁদে দিলেন এবং বললেন, হে হাজ্জাজ! আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, আলেমদের সাথে বেয়াদবী করো না”। * নবী করীম ﷺ বলেছেন, দাঁড়ি-চুল পাকা মুসলমান, কোরান বহনকারী (শিক্ষক) এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার সমতুল্য। * ইবনে ওহহাব (রহ) বলেন, إِنَّمَا حَصَلَ مَا حَصَلَ مِنَ الْعِلْمِ بِفَضْلِ التَّعْظِيْمِ وَ الْإِجْلَالِ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىٰ অর্থাৎ- ইলম বা জ্ঞান থেকে যা হাসিল হয়েছে, তা হয়েছে একমাত্র ওস্তাদ ইমাম মালেক (রহ) কে সম্মান ও ইজ্জত করার কারণেই। ছাত্রের উচিত শিক্ষকের কথা মনযোগ দিয়ে শ্রবন করা। যদি তার কথা বুঝে না আসে, তাহলে বুঝার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাওয়া। শিক্ষকের সাথে হৈ-চৈ করা এবং তার সামনে অনর্থক কথা বলা বেয়াদবী। হে প্রিয় বৎস! শিক্ষকের সম্মান করো, নিজের জীবনের উন্নতির সোপান খুলে যাবে। জীবনে যদি বড় কিছু হতে চাও, শিক্ষকের সাথে আদব রক্ষা করিও। মনযোগের সাথে আমার কথাগুলো শ্রবন করো, সফলতা ফিরে আসবে। * ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ) বেয়াদবী হয়ে যাওয়ার আশংকায় তার উস্তাদের নাম পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করতেন না। প্রয়োজন হলে লকব দ্বারাই যথেষ্ট করতেন। হে ছাত্র! বেশী বেশী উস্তাদের সোহবাত লাভ করো। * ইমাম বুখারী (রহ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কি কোনো কিছুর আকাঙ্খা করেন?

তখন সে বলেছিল, হ্যা। যদি আমার ওস্তাদ আলী ইবনুল মাদিনী জীবিত থাকতেন, তাহলে আমি আমার সময়গুলো তার সোহবাতে ব্যয় করতাম। হে ইলমে দীনের তালেব! সদা সর্বদা ওস্তাদের দোয়া নিবে। ওস্তাদের দোয়ার প্রভাব যে কত বেশী! শুন মন দিয়ে, * "শাহ আব্দুর রহমান মুহাদ্দিস পানিপথী (রহ) একবার ছাত্র জীবনে লেখা-পড়ার জন্য নিজ এলাকা 'পানিপথ' ছেড়ে সাহারানপুর গিয়েছিলেন। রওয়ানা দেওয়ার পূর্বে তার সকল শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে ছোট সময়ের একজন ওস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন নি। সাহারানপুর গিয়ে লেখা-পড়া আরম্ভ করলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও পড়া মুখস্থ করতে পারছেন না, যা স্বরণ করেন তাও কোনো কাজে আসে না। অতপর সে ভয় পেয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, পিছনে কিছু ঘটে গেল কি-না। কিছু দিন পর স্বরণে আসলো যে, সে তার এক শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ করেন নি। এতে তিনি খুব আফসোস করলেন। অতপর ওজরখাহী করে খুব দ্রুত সেই শিক্ষকের নিকট চিঠি লিখলেন। সে চিঠিতে সাক্ষাৎ না করার অপরাধ স্বীকার করলেন ও ক্ষমা চাইলেন। এবং বললেন, আপনার প্রতি আমার কোনোই অবহেলা বা হেয় মনোভাব ছিল না বরং সময়ের সংকীর্নতা ও সুযোগের স্বল্পতাই ছিল আসল কারণ। প্রতি উত্তরে ওস্তাদ লিখলেন, হে আব্দুর রহমান! তুমি তোমার সকল শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ করেছ আমি ব্যতিত। ফলে ভাবলাম, হয়তবা আমার মূল্য তেমার কাছে নেই। যেহেতু আমি তোমার নিচের ক্লাশের শিক্ষক। এই ভেবে মনে খুব ব্যথা অনুভব করলাম। কিন্তু তোমার চিঠি পেয়ে বুঝতে পারলাম যে, বিষয়টি সেরকম নয়। এখন আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। হৃদয় থেকে ক্ষমা করে দিলাম। শাহ আব্দুর রহমান মুহাদ্দিস পানিপথী (রহ) যখন চিঠির প্রতি উত্তর পেলেন, তখন হৃদয়ে শান্তি অনুভব করলেন এবং পূর্বের ন্যায় লেখা-পড়া আরম্ভ করলেন। এবার অল্পতেই তার সকল পড়া-লেখা মুখস্থ হতে লাগল এবং স্মৃতিশক্তি আরো বেড়ে গেল"। ছাত্রের উচিৎ, যদি কখনো শিক্ষকের সাথে বেয়াদবী হয়ে যায়, সাথে সাথে লজ্জিত হওয়া এবং বিলম্ব না করে দ্রুত তার নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা। হে বৎস! তুমি কোন ধরনের জ্ঞান শিক্ষা করবে, তা তোমার মুত্তাকী-পরহেজগার শিক্ষক থেকে নির্বাচন করে নিবে।

ইমাম বুখারী (রহ) তার ওস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (রহ) এর নিকট গিয়ে ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, আমি তোমার জন্য ইলমে হাদিস শিক্ষা করা ভালো মনে করি। শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করে ইলমে হাদিস চর্চায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইমাম বুখারী (রহ) তার শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করার বরকতে "أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْن فِى الحَدِيْثِ الشَّرِيْف" উপাধি লাভ করেছিলেন। * মারজা মাযহার জানে জানান যিনি ইলমে হাদিসের সনদ লাভ করেছিলেন তার সম্মানিত শিক্ষক আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আফজাল (রহ) থেকে। মারজা মাযহার বলেন, ইলমে দীন হাসিলের শেষে আমার ওস্তাদ আমাকে একটি টুপি হাদিয়া দিয়েছিলেন, যা তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর পর্যন্ত তার মাথায় পাগড়ীর নিচে পরিধান করেছিলেন। আমি টুপিটিতে ময়লা থাকার কারণে দীর্ঘ রাত পানিতে

ভিজিয়ে রাখলাম। অতপর দেখলাম, দীর্ঘ দিন না ধোয়ায় টুপিতে ময়লা বেশী থাকার কারণে পানি কালো রং ধারণ করেছে। সকাল বেলায় আমি সবটুকু পানি পান করে ফেললাম। পানি পান করার পর দেখলাম যে,আমার ক্বলব নূরে ভরে গেল এবং কিতাব না বুঝার যে জটিলতা ছিল, তাও দূর হয়ে গেল। হে বৎস! আদবের নজীর লক্ষ্য কর, * আল্লামা ইমাম রবী (রহ) বলেন, إِنَّهُ لَمْ يُقَلِّبْ أَوْرَاقَ الْكِتَابِ بِالْقُوَّةِ خَشْيَةَ أن يَّتَأَذَّى الْأَسْتَاذُ بِهٰذا الصَّوْتِ – অর্থাৎ- তিনি তার শিক্ষকের কষ্ট পাওয়ার আশংকায় তার সামনে জোর আওয়াজে কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টাতেন না। শিক্ষক ছাত্রের কোনো জানা বিষয়ে যদি আলোচনা করেন, তাহলে তার উচিৎ, তার সামনে নিজের ইলমকে প্রকাশ না করা। শিক্ষকের দূর্বলতা আলোচনা করা ছাত্রের জন্য বেয়াদবীমূলক আচরণ। * رِسَالَةٌ إِلىٰ الْجِيْلِ الْجَدِيْد কিতাবে আছে, لا يَنْقَطِعُ حَقَّ الْأَسْتَاذِ بِإِنْقِطَاعِ لِقَائِهِ وَ الْإِبْتِعَادِ عَنْهُ جِسْمًا بَلْ فِى فَتْرَةِ الْإِنْقِطَاعِ أيْضًا يَجِبُ عَلىٰ التِّلْمِيْذِ أنْ يَتَفَقَّدَ أَحْوَالَهُ وَ يَشُدَّ الرِّحَالَ إِلَيْهِ لِغَرْضِ الزِّيَارَةِ- অর্থাৎ- শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ করার দ্বারাই তার অধিকার আদায় শেষ হয়ে যায় না। এবং শারীরিকভাবে তার থেকে দূরে থাকার দ্বারাও নয়। বরং শিক্ষক থেকে দূরে চলে গেলেও ছাত্রের জন্য আবশ্যক যে, সে সর্বদা তার খোজ-খবর নিবে এবং সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাহন হাকাবে। * শরহে তরীকাতে মুহাম¥াদিয়া কিতাবে লেখা আছে, "ইমাম হালওয়াই (রহ) একবার বুখারা শহর ত্যাগ করে অন্য এক শহরে চলে গেলেন। তখন ইমাম জারজুনী ব্যতিত সেখানকার সকল ছাত্র তার সাথে সাক্ষাত করেছিল। কিছুদিন পর ইমাম জারজুনী তার নিকট এসে মায়ের খেদমতের ওজর পেশ করল এবং যথাসময়ে সাক্ষাত না করতে পারার জন্য আফসোস প্রকাশ করল। তখন শিক্ষক ইমাম হালওয়াই (রহ) কে বললেন, "মায়ের খেদমতের দ্বারা তোমার হায়াতে বরকত হবে। তবে ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর বাস্তবে তা হয়েও ছিল"। * تَعْلِيْمُ المُتَعلِّم কিতাবে লেখা আছে- "শায়খ ইমাম ছাদীদুদ্দিন সিরাজী বলেন, আমাদের মাশায়েখগণ বলতেন, যে ব্যক্তি তার ছেলেকে আলেম বানাতে চায়, তার উচিৎ শিক্ষকের সম্মান করা, মাঝে মাঝে খাবার খাওয়ানো ও হাদিয়া প্রদান করা। এতে যদি ছেলে আলেম নাও হয়, নাতি বা পরবর্তি কেউ আলেম হবে। * تَعْلِيْمُ المُتعَلِّم কিতাবে আরো লেখা আছে- শিক্ষকের সম্মানের মধ্যে রয়েছে- তার আগে আগে না চলা, তার স্থানে না বসা, তার অনুমতি ব্যতিত তার সাথে কথা শুরু না করা, তার সামনে বেশী কথা না বলা, শিক্ষকের বিরক্তির অবস্থায় তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করা, তার সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা, তার দরজায় করাঘাত না করা, বরং ধৈর্যের সাথে বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। * হাকিমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, শিক্ষকদের প্রতি মহব্বত ও সম্মানের কারণেই দিয়েছেন। * খলিফা হারুন-অর রশীদ তার ছেলের লেখা-পড়ার খোজ খবর নেওয়ার জন্য শিক্ষক ইমাম আসমায়ী (রহ) এর নিকট খাদেম পাঠালেন। খদেম গিয়ে দেখল, ইমাম আসমায়ী অজুর শেষে পা ধৌত করতেছেন আর খলিফার ছেলে তার পায়ে পানি ঢালতেছেন। খলিফার নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি ইমাম আসমায়ী (রহ) কে বললেন, আমি আপনার নিকট আমার ছেলেকে

জ্ঞান ও উত্তম আদব শিখার জন্য দিয়েছিলাম। আপনি যদি ছেলেকে আদব শিক্ষা দিতেন! অতপর খলিফা বললেন, আপনি যদি আমার ছেলেকে এক হাতে আপনার পায়ে পানি ঢালা ও আরেক হাত দিয়ে পা ধুয়ে দেওয়ার আদেশ করতেন, তাহলে আমি খুব আনন্দিত হতাম।

শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ) শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ) এর খাছ ছাত্র ছিলেন। একবার ইংরেজরা শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ) কে বন্দি করে মাল্টা দ্বীপে নির্বাসন দেওয়ার জন্য জাহাজে উঠালেন। তখন ছাত্র শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ) ও খাদেম হিসাবে তার সাথে জাহাজে উঠতে চাইলেন। ইংরেজরা বলল, তুমিতো আমাদের দৃষ্টিতে কোনো অপরাধ কর নি। তাই তোমাকে কোনক্রমেই জাহাজে উঠানো যাবে না, এই বলে তারা জাহাজ ছেড়ে দিল। তখন ছাত্র শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ) ওস্তাদের বিয়োগ বেদনায় অস্থির হয়ে সমুদ্রে জাপ দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন। ইংরেজরা তখন বাধ্য হয়ে তাকেও শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ) এর সাথে জাহাজে তুলে নিলেন। (আমার প্রিয় ওস্তাদ আব্দুল গফফার কাসেমী (মা.জি) যিনি ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসায় দীর্ঘদিন লেখা-পড়া করেছেন। বর্তমানে ছারছীনা দারুসসুন্নাত দীনিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস। তিনি বলেন,) ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ে যখন মাল্টা দ্বীপে নির্বাসিত হলেন, তখন সেখানে দু’টি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলো। এক. শীতের কারণে প্রচন্ড ঠান্ডা। দুই. রমজান মাস থাকার কারণে খতম তারাবীহের ব্যবস্থা না থাকা, যেহেতু ছাত্র ও শিক্ষক কেউ হাফেজ ছিলেন না। ছাত্র শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ) চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, আমার ওস্তাদতো কখনোই খতম তারাবীহ ছাড়েন নি। দ্বিতীয়ত, এতো ঠান্ডার মধ্যে কিভাবে অজু করবেন? উভয় সমস্যা নিরসনের জন্য হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ) লোটায় পানি নিয়ে নিজের কোলে রেখে গরম করে শিক্ষকের অজুর পানির ব্যবস্থা করতেন। আর দৈনিক সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এক পারা করে কোরান মুখস্ত করে শিক্ষকের খতম তারাবীহের ব্যবস্থা করতেন। ঘটনাক্রমে হঠাৎ একদিন রাতে অজুর পানির ব্যবস্থা করতে না পারায় সকাল বেলায় অজু করার জন্য ঠান্ডা পানি পেশ করলে শিক্ষক বললেন, হুসাইন আহমাদ! আজকের পানি ঠান্ডা কেন? তখন শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ) সব ঘটনা খুলে বললেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আজ সেই ছাত্র শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ) ই শিক্ষকের দোয়ার বরকতে হয়ে গেলেন তামাম বাংলা, ভারত ও পাকিস্তানসহ বহু দেশের হাজার হাজার ছাত্রদের শিক্ষাগুরু। * কাজী ইমাম ফখরুদ্দীন ইরছাবান্দী (রহ) এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যাকে তৎকালীন সকল মানুষ এমনকি বাদশাও খুব সম্মান করত। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, আমি আমার ওস্তাদ আবু ইয়াযীদ দাবুছীর বহু খেদমত করতাম। এমনকি ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি তার খাবার রান্না করেছি ; কিন্তু একদিনও সেখান থেকে সামান্যতম খাবার গ্রহণ করি নি। পরবর্তিতে তিনি শুকরিয়া স্বরুপ বলতেন, ওস্তাদের খেদমতের বরকতেই আমার আজকে এত মর্যাদা। * হাকিমুল উম্মত শাহ

আশরাফ আলী থানবী (রহ) ছাত্রজীবনে প্রতি জুমার দিনকে ওস্তাতদের খেদমতের জন্য নির্ধারণ করতেন। জুমার দিন তিনি তার শিক্ষক মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহ), মাওলানা দেহলবী (রহ), মাওলানা মানফায়াত আলী (রহ) সহ আরো অন্যান্য শিক্ষকদের এক ঘণ্টা করে খেদমত করতেন। উপরের আলোচনা থেকে আমরা যা-কিছু পেলাম:- এক নজরে শিক্ষকদের প্রতি আদব ১. শিক্ষকের সাথে সচরাচর সাক্ষাত হলে, সালাম দিবে। ২. দীর্ঘদিন পরে সাক্ষাত হলে সালাম দিবে, মুছাফাহা ও কদম বুছী করবে। ৩. চলতিপথে সাক্ষাত হলে একপাশে দাড়িয়ে সালাম দিবে। ৪. ছাত্রাবাসে অবস্থান করলে মাঝে মাঝে শিক্ষকদের রুমে গিয়ে সাক্ষাত করবে। ৫. মাঝে মাঝে শিক্ষকদের খেদমত করবে। যেমন:- জামা-কাপড় ধুয়ে দিবে, তার রুম ঝাড়-দিবে বা অন্য যে কোনো ধরণের খেদমত করবে। ৬. যে সকল স্থানে শিক্ষক সচরাচর বসেন, সেখানে বসবে না। ৭. শিক্ষকের সাথে নম্র ভাবে কথা বলবে। ৮. শিক্ষকের সামনে উচু আওয়াজে কথা বলবে না। ৯. শিক্ষকের সাথে তর্ক করবে না। ১০. শিক্ষকের সাথে সর্বদা বিনয় প্রকাশ করবে। ১১. শিক্ষকের আদেশ-নিষেধ পালন করবে। ১২. সকল কাজে শিক্ষকের পরামর্শ নিবে। ১৩. শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করলে দাড়িয়ে সালাম দিবে। অতপর চুপচাপ নিজ নিজ সীটে বসে যাবে। ১৪. শিক্ষককে হেয় বা অপমানজনক কোনো আচরণ করবে না। ১৫. শিক্ষকের সমালোচনা করবে না। ১৬. শিক্ষককে আটকানোর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করবে না। ১৭. মাঝে মাঝে শিক্ষকদের হাদিয়া দিবে। ১৮. শিক্ষকের কাজে সাহয্যের প্রয়োজন হলে, সাহায্য করবে। ১৯. শিক্ষকের মনে কষ্ট দিবে না। ২০. কোনো শিক্ষক বিপদে পড়লে যথাসম্ভব সাহায্য করবে। ২১. শিক্ষক ডাকলে গড়িমষি না করে তাড়াতাড়ি সাড়া দিবে। ২২. শিক্ষকদের আসবাব-পত্রের সম্মান করবে। ২৩. শিক্ষকের সামনে খালি গায়ে টুপিবিহীন আসবে না। ২৪. শিক্ষকদের সন্তানদেরকে ইজ্জত করবে। ২৫. শিক্ষকদের মনে ব্যথা দিয়ে থাকলে, ক্ষমা চেয়ে নিবে। ২৬. শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিভাবকের কাছে নালিশ দিবে না। ২৭. শিক্ষকের সামনে আসন গেড়ে বসবে না। ২৮. শিক্ষকের সাথে ছাত্রের সম্পর্ক মনের দিক দিয়ে। তাই এমন আচরণ করবে না যাতে তার মনে ব্যথা পায়। ২৯. শিক্ষক থেকে কোনো কাজ হাসিলের জন্য পিড়াপীড়ি করবে না। ৩০. মসজিদে শিক্ষকের সামনে আদব বজায় রেখে বসবে। হে প্রিয় বৎস! তোমার ছাত্র জীবনটা উপরোক্ত বিষয়ের সাথে মিলিয়ে নাও। আর লক্ষ্য কর, তোমার ছাত্র জীবনের ত্রুটিগুলো কোন্ কোন্ জায়গায়। অতপর সংশোধন করে নাও তোমার জীবনটা। বড় যদি হতে চাও, বড়দের ছাচে জীবনকে গড়ার দৃঢ় পরিকল্পনা কর। সর্বশেষ, ইলমে দীনের প্রতিটি ছাত্রের প্রতি পরামর্শ, তোমরা এই লেখাটি একাধিক বার পড় আর ভুলগুলো সংশোধন করার চেষ্টা কর। আল্লাহ তায়ালার রহমতে অনেক অনেক অনে——ক বড় হয়ে যাবে। ইনশা আল্লাহ